Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফাজিলাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Farhana

রোলঃ 227020556

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফাজিলাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Farhana

রোলঃ 227020556

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফাজিলাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Farhana আইডিঃ 227020556 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফাজিলাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Farhana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Farhana

আইডিঃ 227020556

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ এর ফাজিলাত 5

প্রথম পর্ব 9

বালা মুসিবতের প্রথম উল্লেখযোগ্য কারণ 9

জান্নাতের পথ বড়ই বন্ধুর 14

জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা 17

বাতিল শক্তি যখন ঈমানদারগণের উপর মুসিবত স্বরুপ 18

আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর প্রাণ ওষ্ঠাগত পরীক্ষায় সবর অতঃপর বিজয় 22

ঈমানদারের পরীক্ষা স্বরুপ বালা মুসিবত স্রোতের গতির মতো তেড়ে আসে 30

বালা’ মুসিবত হচ্ছে মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী 32

পরীক্ষায় হিম্মত না হারানো; দুঃখবোধ না রাখা 34

মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চারটি কাজের একটি হলো সবরের তাকীদ করা 36

সবরকারীকে আল্লাহ সুবহানাহ ভালোবাসেন তার ঘোষণা 37

ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবরের পুরষ্কার 38

ঈমানের পরীক্ষায় সবর না করার পরিণাম 38

জলন্ত চুল্লির সামনে মুমিনের সবর ও অবিচলতা 39

সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকাটাই বড় সবর 40

নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘায়িত ৯শত বৎসর সবর করেছিলেন 41

বিপদ ও ধৈর্য 42

ধৈর্যের প্রতিদান 43

ধৈর্য্যের প্রতিফল 44

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া 45

সর্বাবস্থায় সবর সুখের চাবিকাঠি 47

ধৈর্য্য ও সবরের তাৎপর্য গুরুত্ব ও ফযীলত: 50

সবরের অর্থ ও তার প্রকার 52

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ 55

সবর জ্যোতিস্বরুপ 57

ক্বুরআনে আলোকে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য 64

ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা 65

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা 65

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা 66

দ্বিতীয় পর্ব 68
বালা মুসিবতের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারণ 68
গুনাহ-পাপাচারের জন্যই বালা মুসিবতের আধিক্য 73
গুনাহের প্রতিবিধান তাওবায় 74
গোনাহের প্রভাব 76
বিপদ আপদ বা বালা মুসিবতে নিপতিত হলে আমাদের করণীয় কি? 79
বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ 80
সকাল- সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দু‘আ : 87
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য ও সবর 88
দ্বীনের পথে সাহাবীদের জুলুম-নির্যাতন সহ্যের কিছু দৃষ্টান্ত 91
বেশী বেশী নেক আমল বা সৎকাজ করা 96
আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দু‘আ করা 97
আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন 99
বালা মুসিবতের মোকাবেলার তিনটি উপায় আছে ধৈর্য, দুআ ও শুভ পরিণতির অপেক্ষা 100
মুসীবতগ্রস্তের চিকিৎসায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। 103
বালা মুসিবত দূরিকরণে ইসলাহের গুরুত্ব 108
ইসলাহের পথে যে কাজগুলো করা জরুরি 109
মুসিবতের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য কবীরা গুনাহ বর্জন 111
হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার বিনষ্টকারী কবীরা গুনাহসমূহ 112
হাক্কুল ইবাদ তথা সৃষ্টির অধিকার সংক্রান্ত কবীরা গুনাহ 118
আরো কিছু কবীরা গুনাহ 123
থিসিসের উৎস সমুহ যথাক্রমে 125

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ এর ফাজিলাত.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى
آله وصحبه أجمعين

বালা' আরবি শব্দ (بلاء) থেকে। এর অর্থ বিপদ। সাধারণত বিপদ বোঝানো হয়।আর মুসিবতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিয়োগান্তক ঘটনা; বিপর্যয়; দুর্যোগ; দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় মুসিবতকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
বিপদমুসিবত নিয়ামতদাতা ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলতঃ মুসিবতসমূহ হচ্ছে প্রতিদান ও প্রতিফলের চাবিকাঠি এবং কখনো কখনো বালা মুসিবত আসে দুনিয়ায় শাস্তি স্বরুপ। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি আমরা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে পারি, নিজেদের ইসলাহ করতে পারি, সবরের সাথে দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত থাকতে পারি তাহলে শেষ বিচারের দিনে অবশ্যই তার প্রতিদান ও প্রতিফল পাব।

হুযাইফা ইবনু কাতাদাহ রহি'মাহুল্লাহ বলেন,
«বান্দার জীবনে সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো, অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া।»(আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৬৯)

প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি (ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন) মুসিবত সবচেয়ে কঠিনতম মুসিবত। অর্থাৎ যা কিছু দিয়ে ঈমানদারদের সবচেয়ে বড় সম্পদ দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই হলো কঠিন মুসিবত,এই মুসিবতে ধৈর্য ও সবর হচ্ছে উত্তরণের পথ। মুসিবতে নিপতিত করার মাধ্যমে মানুষের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে দেওয়া হয়। এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মর্যাদা কেবল বিপদ মুসিবতের সময়ই জানা যায়। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন: "যতক্ষণ মানুষ নিরাপদে থাকে আড়াল হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই তাদের উপর কোন বালা-মুসিবত নেমে আসে তখনই তারা তাদের স্বরূপে ফিরে আসে। তখন ঈমানদার তার ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং মুনাফিক তার নিফাকের দিকে ফিরে আসে।"

বালা-মুসিবত তাওহীদ, ঈমান ও তাওয়াক্কুলের অন্যতম একটি শিক্ষা।

বালা-মুসিবত বাস্তবে নিজের স্বরূপ নিজের কাছে প্রতীয়মান হয় যাতে করে ব্যক্তি জানতে পারে যে, সে একজন দুর্বল দাস, তার রব ছাড়া তার কোন ক্ষমতা নেই শক্তি নেই। তখন সে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করবেন। পরিপূর্ণভাবে তাঁর কাছে আশ্রয় নিবেন; আর তখনি গৌরব, অহমিকা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, প্রবঞ্চনা ও গাফলতির পতন হবে।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম رحمه الله বলেন:

“যদি না আল্লাহ্ বান্দাকে বিপদমুসিবতের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা না করতেন তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করত, অবাধ্য হত ও ধৃষ্টতা দেখাত। আল্লাহ্ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তার অবস্থা অনুপাতে তাকে পরীক্ষার ঔষধ সেবন করান। এর মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংসাত্মক রোগ-বালাই থেকে মুক্ত করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে পরিশোধিত, নির্মল ও পরিশুদ্ধ করেন: দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সওয়াব দেয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করেন। সেই মর্যাদা হচ্ছে তাঁর দাসত্ব এবং সেই সওয়াব হচ্ছে তাঁর দর্শন ও তাঁর নৈকট্য।”[যাদুল মাআদ (৪/১৯৫)]

বালা মুসিবত মুমিন বান্দাকে তার পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমনিভাবে সাদা কাপড়কে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করা হয়; ফলে সে বালা-মুসিবত থেকে ঐ দিনের মত (পাপমুক্ত হয়ে) বের হয়, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছে।সাদ্দাদ ইবনু আউস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ ، وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ » .

(رواه أحمد) .

«নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাগণের মধ্য থেকে কোনো মুমিন বান্দাকে কোনো বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করি, অতঃপর সে আমার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা করা অবস্থায় আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার শয্যা থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ অবস্থায় উঠবে, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছে; আর মহান রব বলবেন: আমি আমার বান্দাকে আটক করেছি এবং তাকে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করেছি, তোমরা তার জন্য সাওয়াব লিখবে, যেমনিভাবে তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য সাওয়াব লিখতে।»[আহমাদ: (৪/১২৩); সনদের মান হাসান]

বালা মুসিবত আমাদের দুনিয়ার জীবনে দুই প্রধান কারণে ঘটে থাকে।

<u>**প্রথমত**</u> আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার চিরাচরিত নিয়ম তার বান্দা বান্দিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা যাতে তিনি সুবহানাহ তাঁর বান্দা-বান্দিকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং পুরুস্কৃত করতে

পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়ে কুর’আনুল কারীমে উল্লেখ করেন-

وَ لَنَبۡلُوَنَّکُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ الَّذِیۡنَ اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِیۡبَۃٌ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیۡهِ رٰجِعُوۡنَ ‘নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ-প্রাণ ও ফলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ-আপদ আসে; তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই ফিরে যাব।' (সুরা বাকারা :১৫৫-১৫৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় বড় পুরষ্কার বড় মুসিবত তথা বিপদের বিনিময়ে পাওয়া যায়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তার ওপর বিপদাপদ চাপিয়ে দেন। সুতরাং (বিপদের সময়) যে সন্তুষ্ট হবে, তার জন্য সন্তুষ্টি থাকবে; আর যে অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অসন্তুষ্টিই থাকবে।’ (তিরমিজি)

দ্বিতীয়ত দুর্যোগ দুঃখ যন্ত্রনায় আমরা নিপাতিত হই নিজেদের হাতের কামাই স্বরুপ। অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের জন্য তাদের ওপর বিপদ-আপদ নেমে আসে এ সম্পর্কেও কিতাবুল্লাহ ও সুন্নায় সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

ظَهَرَ الۡفَسَادُ فِی الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ بِمَا کَسَبَتۡ اَیۡدِی النَّاسِ لِیُذِیۡقَهُمۡ بَعۡضَ الَّذِیۡ عَمِلُوۡا لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُوۡنَ

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদের আস্বাদন করানো হয়। যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে।’ (সুরা রূম :৪১)

আরো এরশাদ হচ্ছে, «তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মফল। তিনি অনেক গুনাহ মাফ করে দেন।» (সুরা আশ-শূরা: ৩০)।

‘আর যখন তোমাদের ওপর মুসিবত এল, যার দ্বিগুণ তোমরা ঘটিয়েছ, তখন তোমরা বললে, এটা কোত্থেকে এল! (হে নবী) আপনি বলে দিন, এ তো তোমাদের পাপ থেকেই; নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।’ (সুরা আলি ইমরান: ১৬৫)

ইমরান ইবনু হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «এই উম্মতের জন্য (আজাব হিসেবে) ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথরবর্ষণ ঘটবে।’ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল! এগুলো কখন হবে? তিনি

বলেন, ‘যখন (গায়ক) গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব হবে।» (তিরমিজি:২২১২)

অতএব মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দুনিয়াতে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এর প্রতিনিধি হিসাবে। সুতরাং আমরা আল্লাহ সুবহানাহ’র হুকুম মান্য করবো, এটা আমাদের উপর ফরয। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর অবাধ্য হয়। সে আল্লাহর শাস্তির কথা ভুলে গিয়ে নাফসের তাবেদারী করে স্রোতের সাথে ভেসে যায়। মানুষ জমিনের তার হুকুম অমান্য করে তার বিধান ভুলণ্ঠিত করে অনাচার-পাপাচার করে দুনিয়াকে কলুষিত করে তোলে। ফলে তাদের উপরে নেমে আসে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে নানা ধরনের বালা-মুসিবত।

ক্বুরআন ও হাদীসের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনে বিপদ আপদ তথা বালা মুসিবত আসে দুটি কারণে। এক, পরীক্ষা স্বরুপ।
আর দুই, শাস্তি স্বরূপ। আজকে এ দু'টি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে প্রমাণিত হবে।

إن شاءالله .

প্রথম পর্ব

বালা মুসিবতের প্রথম উল্লেখযোগ্য কারণ

মানুষ বালা মুসিবত ও বিপদ আপদে পতিত হয় পরীক্ষা স্বরুপ:

মুমিনের পরীক্ষা এবং সবর হলো সাথী

يا مخنث العزم اين انت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لا جله نوح ورمى في النار الخليل واضجع للذبح اسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاسى الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسي وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد تزهي انت باللهو واللعب

ওহে ! দুর্বল সংকল্পের অধিকারী তুমি কোথায়?

আরে এটিতো সে পথ,

যে পথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়েছেন আদাম,

ক্রন্দন করতে হয়েছে নুহ কে।

আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে খালিলুল্লাহ ইব্রাহিমকে।

জবেহ করতে চিৎ করে শোয়ানো হয়েছে ইসমাঈলকে।

খুব সল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে ইউসুফকে।

কারাগারে কাটাতে হয়েছে জীবনের দীর্ঘ কয়েকটি বছর।

করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে জাকারিয়াকে।

জবেহ করা হয়েছে সাইয়্যেদ ইয়াহইয়াকে,

দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন আইয়ুব।

অনেক অনেক বেশি ক্রন্দন করেছেন দাউদ।

বন্য প্রাণীর ন্যায় জীবন যাপন করেছেন ঈসা

[আলইহিমুস স্বলাতু ওয়াস সালাম]

নানা ধরনের কষ্ট সহ্য করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ আর তুমি খেল তামাশায় মত্ত!!!

–ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (رحمه الله)

মহা নিয়ামাহ আল ফিরদাউসের মালিক মহান আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এর তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা নেয়া এটাই স্বাভাবিক মাধুর্যময়। এবং সবরের প্রতিদান স্বরুপ যে অফুরন্ত নিয়ামাহ মুমিনগণ লাভ করেন তা আপেক্ষিক পরীক্ষায় মহান রবের করুনাই বটে।

পবিত্র ক্বুর'আন থেকে বান্দার পরীক্ষা নেয়ার এবং সবরের আদেশমুলক নির্বাচিত আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষন।

بســـــــــم الله الرحمن الرحيم

الٓمٓ)1 (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)2 (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
)فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ)3 ۖ

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?
(৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথুকদেরকে। (সূরা আনকাবুত, ১-৩)

আল্লাহ তা'য়ালা যখন এ আয়াত নাজিল করেছিলেন তখনকার অবস্থা ছিল খুবই দুঃখজনক। তাওহীদ গ্রহন করা ব্যক্তি যদি দরিদ্র কিংবা দাস-দাসী হতো তা হলে তাদের ওপর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে পড়তো। ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর হলে রুজি রোজগারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। আর প্রভাবশালী হলে নানাভাবে কষ্ট দেয়া হতো, অপপ্রচার,মিথ্যা অভিযোগ এমনকি তার গোটা পরিবার ধ্বংস করে দেয়া হতো। এরূপ অবস্থায় মক্কা নগরীর গোটা পরিবেশই ভয় আর ত্রাসের রাজত্ব কায়িম হয়েছিল। এই অবস্থায়ও মজবুত ঈমানদার লোকদের

মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবিতে তাদেরও প্রায় কঠিনভাবে প্রাণ কেঁপে উঠতো, যদিও তারা ঈমান ছাড়েননি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহা নিয়ামাহ আল জান্নাহ লাভের জন্য এই দুনিয়ার প্রতিটি সফরে লুকিয়ে আছে পরীক্ষার জন্য দুঃখ, যন্ত্রনা,বালা মুসিবত। শুধু কি জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্ পরীক্ষা নেবেন? না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল আনকাবূতের দুই নাম্বার আয়াতের মধ্যে يُتْرَكُوا শব্দ ব্যবহার করে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, জান্নাত লাভ করার জন্য পরীক্ষা নেয়া হবে, কিন্তু জান্নাত লাভ করতে না পারলে জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে; কাউকেই ছেড়ে দেয়া হবে না।

হাফিজ ইবনু কাসির রহমাতুল্লাহ স্বীয় তাফসিরে বলেন,ইনকার সুচক জিজ্ঞাসা এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অবশ্যই স্বীয় মুমিন বান্দাদের কে তাদের ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করবেন(তাফসীরে ইবনু কাসির:৫/৪৪৫)

খাব্বাব ইবনু আরাত (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) পেশায় ছিলেন সামান্য কর্মকার। এমনই একজন পাক্কা মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে মুমিনদের অবস্থা কী হয়েছিল। খাব্বাব (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেন, যে সময় কাফির মুশরিকদের অত্যাচার জুলুম নির্যাতনে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তখন একদিন আমি রাসূল ﷺ এর সামনে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কা'বা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না? (আলা তাদ'উ লানা আও আলা তাসতানসিরু লানা)
আমার এ কথা শোনা মাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে বসলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। নবীজি বললেন, শোনো খাব্বাব! তোমাদের ওপর সেই কষ্ট অত্যাচার এখনো আসেনি যা তোমাদের পূর্বেকার নবী-রাসূল ও ঈমানদারদের ওপর করা হয়েছে। কাউকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে করাত দিয়ে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছে। আবার কারো হাড়ের গোশত লোহার চিরুনি দিয়ে ছেঁচে ফেলা হয়েছে। এসবের কারণ ঈমানদারদেরকে ঈমানের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার জীবন দেবে তবুও ঈমানের পথ থেকে ফিরে যাবে না। পাক্কা মুসলমান কখনো মাথা নত করতে জানে না। বাতিলের হুংকার, রক্তচক্ষুর ভয় করে না মজবুত ঈমানদারেরা।

মুসলমানদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ।
মুসলমানদের নেতা হলেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরি করে, ত্বগুত (শয়তান) তাদের

অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এরাই হলো জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাকার :২৫৭)

সুতরাং আল্লাহ অভিবাবক হলে মুসলামানদের ভয় কিসের? দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অস্থিরতা এবং কাতর অবস্থাকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে সকল ঈমানদারদের এই বার্তা দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, "লোকেরা কি মনে করেছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ পরীক্ষা করা হবে না?"

দুনিয়া আখিরাতের সফলতা সম্পর্কে যেসব ওয়াদা রয়েছে, তা ঈমানের মৌখিক দাবি দ্বারা পাওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা। অগ্নি পরীক্ষা দিয়েই ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। জান্নাতে যেতে হলে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা বড় শর্ত। জান মালের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। শত অন্যায়, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হবে। বিপদ-আপদ, ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে। একদিকে থাকবে ভয় ও অপরদিকে লালসা- এসবের মধ্যেই ঈমানদারের পরীক্ষা হবে। তদুপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অতি প্রিয় জিনিস কুরবানী করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

«لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ»

«কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।»(সুরা আলে- ইমরান:৯২)

বর্তমান সময়ে এ আয়াতের আলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শয়তানের প্ররোচনায় যারা আল্লাহ, কুরআন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে নিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলছে তারা নবীর ওয়ারিশ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকেও বিভিন্নভাবে ভয় দেখাতে চাচ্ছে। ঈমানদারদের কাছে এসব কিছুই না। তারা এর পরোয়া করে না। তারা বিশ্বাস করে এক আল্লাহর ওপর।

তবে একথা সত্য যে,গুম খুন ,হামলা, মামলা, নির্যাতন, অপপ্রচার, মিথ্যা অভিযোগ, হয়রানি থাকবে কারণ এ অবস্থা সৃষ্টি হলেই প্রকৃত মুমিন চেনা যায়। আল্লাহ বলেন, "এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের ওপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কে? আর তিনি তোমাদের শহীদ হিসেবে কবুল করতে চান।" (সূরা আল ইমরান : ১৪১)

পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন, “অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সকলকেই পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক।”

ঈমানের দাবি করলেই প্রত্যেক কে পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু ঈমানের দাবি করে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোনো পরীক্ষা দিতে আমরা রাজি নই। সস্তা ঈমানের দাবি করে ঝুঁকি মুক্ত কিছু সস্তা আমলের দ্বারা লোভনীয় জান্নাতে যেতে চাই।

আল কুরআন যেখানে ঈমানের কথা বলেছে সেখানেই পরীক্ষার পয়গাম দিয়েছে। ত্বগুতের অপশক্তি আর মুসলামানদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকদের শয়তানি ও দুষ্কৃতির কারণে ভেঙে না পড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহর ওয়াদাকৃত জান্নাত পেতে সদাসর্বদা দুনিয়ার জীবনে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দিতে তৈরী থাকতে হবে। ভরসা রাখতে হবে মহান রবের সাহায্যের ওপর। মুমিনরা সব সময় আল্লাহর ওপর ভরসা করেন কারণ বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

অতএব মুখে মুখে ঈমানের দাবি করার কোনো মূল্য নেই, কুরবানির মাধ্যমে ঈমানের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সকল ধরনের মুসিবতে ধৈর্য ও সবর রাখতে হবে।

আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানের দাবিদারকে খাঁটি ঈমানদার হিসেবে বাছাই করবেন।এভাবে পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে বিভিন্ন বালা মুসিবতের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

জান্নাতের পথ বড়ই বন্ধুর

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট।আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ,২১৪)।

ব্যাখ্যা: এ আয়াত ও আয়াতের মাঝখান একটি পূর্ণাংগ কাহিনী অবর্ণিত রয়ে গেছে। আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হচ্ছে এবং কুরআনের মক্কী সূরাগুলোয় (যেগুলো সূরা বাকারার পূর্ব নাযিল হয়েছে) এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার যে কোন জাতির জন্য যখনই নবীদের আর্বিভাব ঘটেছে তখনই তাঁরা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী গোষ্ঠী অর্থাৎ মুমিনরা আল্লাহদ্রোহী মানব সমাজের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন।

দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যে শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তি এ লড়াইয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার শক্তি চূর্ণ করার জন্য ঈমানদারদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে।

ইবনু কাসীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুকে তার কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন- ‘এই নবুয়তের দাবীদার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি’? আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন- ‘হাঁ’। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- ‘যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল’? তিনি বলেন- ‘কখনো আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনো তিনি।’ হিরাক্লিয়াস বলেন- ‘এভাবেই নবী আলাইহিমুস্ সালামদের পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাদেরই হয়ে থাকে।’ [ইবনে কাসীর]

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য-

প্রথমত: পরিশ্রম ও সাধনা ব্যতীত এবং বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবতে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না। অতএব বালা-মুসিবতে সবর করা ঈমানের

দাবি।সবরের বিনিময়ে জান্নাত দান করা হবে।কারণ, আল্লাহর প্রতিদানে 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম'-এর বাইরে আর কোন তৃতীয় জায়গা তিনি রাখেননি।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: 'সবচেয়ে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর (মর্যাদার দিক থেকে) তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ। [ইবনে মাজাহ্: ৪০২৩]

দ্বিতীয়ত: নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে' এতে সন্দেহ নয়; বরং আল্লাহর ওয়াদা সত্য কিন্তু এর জন্য সময় ও স্থান নির্ধারিত নয়। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন।

মূলতঃ এই পুরো দুনিয়াটাই তো মুমিনের জন্য একটি কারাগার স্বরূপ। তাই কারাগারে দুঃখ-কষ্ট থাকবেই। এ কথাটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জানিয়ে গেছেন-

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِ»

অর্থাৎ আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু থকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়াটা হলো মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।" [মুসলিম: ১৪/২০৫]

আজকে যারা শাসক, অত্যাচার অবিচারের মাধ্যমে অতীষ্ট করে তুলছে সত্যপন্থীদের জীবন, তারাই যে চিরদিন ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকে, একথা সত্য নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে ক্ষমতার আবর্তন ঘটান। তিনি বলেন-

«وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ.»

"মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন।" [সূরা আলি ইমরান: ১৪০]

কখনো কখনো বাতিলপন্থী শক্তির অত্যাচার এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, নবীগণ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন এই বলে যে, "এখন আপনিই প্রতিশোধ গ্রহণ করুন!"

«فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ »

«তিনি তার রবকে ডেকে বললেন: আমি পরাভূত, এখন আপনিই প্রতিশোধ গ্রহণ করুন!» [সূরাহ ক্বমার: ১০]

অতএব ঈমানদারগণ বালা মুসিবতে পতিত হবেন। এটাই জান্নাতে যাওয়ার পরীক্ষা/মাধ্যমে

পৃথিবী তো নিঃশেষের জন্যই সৃজিত হয়েছে। এখানে কেউ থাকবে না; কিছুই থাকবে না। সবাইকেই চলে যেতে হবে। আর এতে রয়েছে ভাল ও মন্দ। যদি চলেই যেতে হয় তবে মন্দকে নিয়ে কেন যাবো? ভালো নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ ডাকছেন মানুষকে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।" [সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫]

অতএব জান্নাতে প্রবেশ করা খুব সহজ নয়। →জান্নাত লাভের জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। →পরীক্ষার বিষয়গুলো যথাক্রমে সম্পদের ক্ষতি, ক্ষুধা, ভয়, ব্যাধি; এমনকি জীবন বিনাশও হতে পারে।

→ঈমানের মান অনুযায়ী পরীক্ষায় কঠোরতা হয়ে থাকে।

→ধৈর্য্যের সাথে উত্তীর্ণ হলে সে অনুযায়ী ফলাফল ও মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে।

→আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের খুব নিকটেই থাকে।

জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَٰهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (সুরা তাওবা,১৬)

উক্ত আয়াতের মধ্যে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, জিহাদের দ্বারা মুসলিমদের পরীক্ষা করা। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী।

তাই বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কালিমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে?অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না।

এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলিমদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততঃকারী, যারা মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য এ আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের দুটি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

এক. শুধু আল্লাহর জন্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে।
দুই. কোন অমুসলিমকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না।

আয়াতে উল্লেখিত শব্দ (وليجة) এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে (بطانة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী]। এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভেতর পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংস সাধনে কোন ত্রুটি বাকী রাখবে না " [সূরা আলি ইমরান ১১৮]

মোটকথাঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা জিহাদের মাধ্যমে তিনি ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবেন। এ ধরনের কথা সূরা আল-আনকাবুত এর ১-৩, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সূরা আলে ইমরানের ১৪২, ১৭৯ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।
[উৎস: তাফসিরে ত্ববারী]

বাতিল শক্তি যখন ঈমানদারগণের উপর মুসিবত স্বরুপ

তখন এহেন বিপদে- মুসিবতে ধৈর্য ধারণ হলো সৎ সাহসের ব্যপার এবং পুন্য লাভের উপায়।

আল্লাহ সুবহানাহ বলেন,
لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۝

«অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহ ব্যাপার।»
(সূরা আলি ইমরান, ১৮৬)

«প্রকৃতপক্ষে বিপদগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যে পুণ্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়»

আলী (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আমাদের নিকট এরূপ অনুভূত হয় যে, যেন কেউ আসছেন। পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে, কিন্তু কোন লোককে দেখা যায় না। তিনি এসে বলেনঃ হে নবী পরিবারের লোকগণ! আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক! প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী। কিয়ামতের পর আপনাদের সকলকেই সমস্ত কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে তাদের পুরস্কার মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করুন এবং তারই নিকট মঙ্গলের আশা রাখুন। জেনে রাখুন যে, প্রকৃতপক্ষে বিপদগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যে পুণ্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। আপনাদের উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে শান্তি, করুণা ও বরকত নাযিল হোক।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

হযরত আলী (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) এর ধারণা মতে তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সারকথা এই যে, সফলকাম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ «জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম।»
আল্লাহ বলেন, যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছ ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ সেই সফলকাম হয়েছে।

এই পরকালের তুলনায় দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা ক্বুর'আনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

"দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস।" কুরআনের আরো বলা হয়েছে «তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী।» (৭৮:১৬-১৭)

অন্য জায়গায় রয়েছে-তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রুপ'।

কাতাদাহ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)বলেন, দুনিয়া প্রতারণার একটা বেড়া ছাড়া আর কি? যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে। যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই তাঁর শপথ! এ তো অতিসত্বরই তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করতঃ আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে পড় এবং সাধ্যনুসারে পুণ্য অর্জন কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয় না।

অতএব দুনিয়ার অসারতা উপলব্ধি করা সহজেই অনুমেয় এবং ঈমানদারগণের জন্য রবের পরীক্ষায় সবর রাখা কঠিন কিছু নয় বরং সে মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে বিরাট পুন্যের অধিকারী হতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, মুমিনের পরীক্ষা অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনো জীবনের উপর, কখনো অর্থের উপর, কখনো পরিবারের উপর এবং কখনো অন্য কিছুর উপর, কখনো

পরীক্ষা আসে বাতিল শক্তির তিক্ততার মধ্যে। বাতিলের অশোভন আচরণ নিযার্তন সবকিছুই মুসিবত এবং এটাই ঈমানের পরীক্ষা

মুত্তাকীর তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে খুব বেশী ধর্মভীরু তার পরীক্ষা বেশী কঠিন হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা সাহাবা-ই-কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে সংবাদ দিচ্ছেন-বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে। তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা। দিয়ে বলেছেন- সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার উপর এটা খুব কঠিন কাজই বটে'। উসামা ইবনে যায়িদ রদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরিক ও আহলে কিতাবের অপরাধ প্রায়ই ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্যধারণ করতেন ও আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের উপর আমল করতেন। অবশেষে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের তাফসীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করতঃ উসামা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে রোগাক্রান্ত হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে দেখবার জন্যে বানূ হারিস খাযরাজ গোত্রের মধ্যে গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে একটি জনসমাবেশ দেখা যায়, যেখানে মুসলমান, ইয়াহূদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর রঙ্গেই রঞ্জিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বিদ্যমান ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সোয়ারী হতে ধূলোবালি উড়তে থাকলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলেঃ ‘ধূলা উড়াবেন না।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটে পৌঁছেই গিয়েছিলেন। সোয়ারী হতে নেমে তিনি সালাম করেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন।

তাদেরকে তিনি কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াতও শুনিয়ে দেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলে, শুনুন জনাব, আপনার এ পন্থা আমাদের নিকট মোটেই পছন্দনীয় নয়। আপনার কথা সত্যই বা হলো, কিন্তু তাই বলে এটা উচিত নয় যে, আপনি আমাদের সমাবেশে এসে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন। আপনার বাড়ীতে যে যাবে তাকেই আপনি শুনাবেন’।

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শুনবার তো আমাদের চাহিদা আছেই। তাদের মধ্যে তখন হট্টগোলের সৃষ্টি হয়ে যায়। একে অপরকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবার উপক্রম হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বুঝানোর ফলে অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর আরোহণ করে হযরত সা'দ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-এর নিকট গমন করেন এবং তথায় গিয়ে হযরত সা'দ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে বলেনঃ হে আবু হাব্বার! আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তো আজকে এরূপ এরূপ করেছে।'

সা'দ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেন, এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তার শপথ! আপনার সঙ্গে তো তার চরম শত্রুতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, এখানকার মানুষ তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্যে নেতৃত্বের পাগড়ী তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় নবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নবী বলে স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যেই সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর গুরুত্ব দেবেন না।'

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন এবং এটা তার অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াহূদী ও মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের উপর আমল করতেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম। বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাতে বায়আত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলমানরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না।

সুতরাং এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক হকপন্থী যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদ-আপদ সহ্য করা, তার উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিনদের একান্ত কর্তব্য।

(উৎস: তাফসিরে ইবনু কাসির)

আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর প্রাণ ওষ্ঠাগত পরীক্ষায় সবর অতঃপর বিজয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আহযাবে বলেন,

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا)10 (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا)11

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (সূরা আহজাব, ১০-১১)

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ যা (আহযাবের যুদ্ধ হিসেবেও পরিচিত) সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। যখন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তিসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। কাফির জোটবাহিনি সর্বমোট দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করলো এবং মদীনার দিকে ধাওয়া করলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺএ সংবাদ পেয়ে হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহ আনহু-এর পরামর্শক্রমে, মদীনার পূর্ব দিকে খন্দক খনন করতে শুরু করলেন। সমস্ত মুহাজির ও আনসার এ খনন কার্যে অংশগ্রহণ করলেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও একাজে অংশ নিলেন। স্বয়ং তিনি কাদা-মাটি বহন করতে লাগলেন। মুশরিকদের সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং মদীনার পূর্বাংশে উহুদ পাহাড় সংলগ্ন স্থানে নিজেদের শিবির স্থাপন করলো। এটা ছিল মদীনার নিম্নাংশ। মদীনার উপরাংশে তারা এক বিরাট সৈন্য দল পাঠিয়ে দিলো যারা মদীনার উঁচু অংশে শিবির স্থাপন করলো এবং নীচে ও উপরের দিক থেকে মুলমানদেরকে অবরোধ করে ফেললো।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজারেরও কম ছিল। কোন কোন রিওয়াইয়াতে শুধু সাতশ' বলা হয়েছে। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকাবিলার জন্যে আসলেন। তিনি সালা পাহাড়কে পিছনের দিকে করলেন। শত্রুদের দিকে মুখ করে তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। যে খন্দক তিনি খনন করেছিলেন তাতে পানি ইত্যাদি ছিল না। তা শুধু একটি গর্ত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশু ও মহিলাদেরকে মদীনার একটি মহল্লায় একত্রিত করে রেখে দেন। মদীনায় বানু কুরায়যা নামক ইয়াহুদীদের একটি গোত্র বসবাস করতো। তাদের মহল্লা ছিল মদীনার পূর্ব দিকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাদের দৃঢ় সন্ধিচুক্তি ছিল। তাদেরও বিরাট দল ছিল। প্রায় আটশ' জন বীর যোদ্ধা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মুশরিক ও ইয়াহূদীরা তাদের কাছে হুয়াই ইবনে আখতাবকে পাঠিয়ে দিলো। সে তাদেরকে নানা প্রকারের লোভ-লালসা দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নিলো। তারাও ঠিক সময়ে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং প্রকাশ্যভাবে সন্ধি ভেঙ্গে দিলো। বাইরে দশহাজার শত্রু সৈন্য ছাউনি ফেলে বসে আছে।

এদিকে ইয়াহূদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা যেন বগলে ফোড়া বের হওয়া। বত্রিশ দাঁতের মধ্যে জিহ্বা অথবা আটার মধ্যে লবণের মত মুসলমানদের অবস্থা হয়ে গেল।

এ সাতশ জন লোক কি-ই বা করতে পারে? এটা ছিল ঐ সময় যার চিত্র কুরআন কারীম অংকন করেছে যে, তখন মুমিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। শত্রুরা একমাস ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখলো। যদিও মুশরিকরা খন্দক অতিক্রম করতে সক্ষম হলো না। তবে তারা মাসাধিককাল ধরে মুসলমাদেরকে ঘিরে বসে থাকলো। এতে মুসলমানরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আমর ইবনে আবদে অদ্দ, যে ছিল আরবের বিখ্যাত বীর পুরুষ, সেনাপতিত্ব বিষয়ে যে ছিল অদ্বিতীয়, একবার সে নিজের সাথে কয়েকজন দুঃসাহসী বীরপুরুষকে নিয়ে সাহস করে অশ্বচালনা করলো এবং খন্দক পার হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় অশ্বারোহীদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু বলা হয় যে, তাদেরকে তিনি প্রস্তুত না পেয়ে হযরত আলী (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে তাদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন। অল্পক্ষণ ধরে উভয় পক্ষের বীরপুরুষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকলো। অবশেষে আল্লাহর সিংহ হযরত আলী (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) শত্রুদেরকে তরবারীর আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

এতে মুসলমানরা খুবই খুশী হলেন এবং তাঁদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা বুঝে নিলেন যে, তাদের জয় সুনিশ্চিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ভীষণ বেগে ঝড় তুফান ও ঘূর্ণিবার্তা প্রবাহিত হতে শুরু করলো। এর ফলে কাফিরদের সমস্ত তাঁবু মূলোৎপাটিত হলো। কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। অগ্নি জ্বালানো কঠিন হয়ে গেল। কোন আশ্রয়স্থল তাদের দৃষ্টিগোচর হলো না।

পরিশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এরই বর্ণনা কুরআন কারীমে দেয়া হয়েছে এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু । এ আয়াতে যে বায়ুর কথা বলা হয়েছে মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি)-এর মতে ওটা ছিল পূবালী হাওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেনঃ আমার মামা উসমান ইবনে মাযউন (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) খন্দকের যুদ্ধের রাত্রে কঠিন শীত ও প্রচণ্ড বাতাসের সময় খাদ্য ও লেপ আনার জন্যে আমাকে মদীনায় প্রেরণ করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি আমাকে বলেনঃ আমার কোন সাহাবীর সাথে তোমার দেখা হলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।" আমি চললাম। ভীষণ জোরে বাতাস বইতে ছিল। যে সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছিল আমি তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গাম পৌছিয়ে দিচ্ছিলাম। যিনি পয়গাম শুনছিলেন তিনিই তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে চলে আসছিলেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ পিছন ফিরেও দেখছিলো না। বাতাস আমার ঢালে ধাক্কা দিচ্ছিল এবং আমি তাতে আঘাত পাচ্ছিলাম। এমনকি ওর লোহা আমার পায়ে পড়ে গেল। আমি ওটাকে নীচে ফেলে দিলাম। (এটাও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখোনি।" তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। তাঁরা মুশরিকদের অন্তর ও বক্ষ ভয়, সন্ত্রাস এবং প্রভাব দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের সমস্ত নেতা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কাছে ডেকে ডেকে বলেছিলঃ তোমরা মুক্তির পথ অন্বেষণ কর, বাঁচার পথ বের করে নাও।" এটা ছিল ফেরেশতাদের নিক্ষিপ্ত ভয় ও প্রভাব এবং তারাই ছিলেন ঐ সেনাবাহিনী যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।কুফার অধিবাসী একজন নব্যযুবক হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে বলেনঃ হে আবু আবদিল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)! আপনি বড়ই ভাগ্যবান যে, আপনি আল্লাহর নবী ﷺ -কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর মজলিসে বসেছেন। বলুন তো, তখন আপনি কি করতেন?" হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তখন জীবন দানে প্রস্তুত থাকতাম।"

এ কথা শুনে যুবকটি বলেনঃ শুনুন চাচা! যদি আমরা নবী ﷺ-এর যামানা পেতাম তবে আল্লাহর শপথ! আমরা তাঁর পা মাটিতে পড়তে দিতাম না। তাঁকে আমরা নিজেদের ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়ে ফিরতাম।" তিনি তখন বললেনঃ হে আমার প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র! তাহলে একটি ঘটনা বলি, শুনুন। খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর রাত্রি পর্যন্ত নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেনঃ কাফিরদের খবরাখবর আনতে পারে এমন কেউ তোমাদের মধ্যে আছে কি?

আল্লাহর নবী ﷺ তার সাথে শর্ত করছেন যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তাঁর এ কথায় কেউই দাঁড়ালো না। কেননা সবারই ভয়, ক্ষুধা ও ঠাণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আবার তিনি অনেকক্ষণ ধরে নামায পড়লেন। তারপর পুনরায় বললেনঃ যে। ব্যক্তি বিপক্ষ দলের খবর নিয়ে আসবে, আমি তাকে অভয় দিচ্ছি যে, সে অবশ্যই (অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায়) ফিরে আসবে। আমি দু'আ করি যে, তাকে যেন আল্লাহ জান্নাতে আমার বন্ধু হিসেবে স্থান দেন।" এবারও কেউ দাঁড়ালো না। আর দাঁড়াবেই বা কি করে? ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পেট কোমরের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাজতে শুরু করেছিল। ভয়ে তাদের রক্ত পানি হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম ধরে ডাক দিলেন। আমার তো তখন আর তার ডাকে সাড়া দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকলো না। তিনি বললেনঃ 'হুযাইফা' তুমি যাও এবং দেখে এসো তারা কি করছে। দেখো, তুমি যে পর্যন্ত আমার কাছে ফিরে না আসো সে পর্যন্ত নতুন কোন কাজ করে বসো না।" আমি খুব আচ্ছা' বলে আমার পথ ধরলাম।
সাহস করে আমি শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেখানে গিয়ে বিস্ময়কর অবস্থা দেখলাম। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য সৈন্যরা আনন্দের সাথে নিজেদের কাজ করতে রয়েছে। বাতাস চুলার উপর হতে ডেকচিগুলোকে উল্টিয়ে ফেলেছে। তাঁবুর খুঁটি উৎপাটিত হয়েছে। তারা আগুন জ্বালাতে পারছে না। কোন কিছুই সজ্জিত অবস্থায় নেই।

ঐ সময় আবু সুফিয়ান দাড়িয়ে উচ্চ স্বরে সকলকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে কুরায়েশরা! তোমরা নিজ নিজ সঙ্গী হতে সতর্ক হয়ে যাও। নিজ সাথীদের দেখা শোনা কর। এমন যেন না হয় যে, অন্য কেউ তোমাদের পাশে দাড়িয়ে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে।" আমি কথাগুলো শুনার সাথে সাথে আমার পাশে যে কুরায়েশী দাঁড়িয়েছিল তার হাত ধরে ফেললাম এবং তাকে। বললামঃ কে তুমি? সে উত্তরে বললো: আমি অমুকের পুত্র অমুক।" আমি বললামঃ এখন থেকে সতর্ক থাকবে।

আবু সুফিয়ান বললেনঃ হে কুরায়েশের দল! আল্লাহর কসম, আমাদের আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই। আমাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং আমাদের উটগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বনু কুরাইযা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা আমাদেরকে খুব কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর এই ঝড়ো হাওয়া আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আমরা রান্না করে খেতে পারছি না। তবু ও থাকার স্থান আমরা ঠিক রাখতে পারছি না। তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমি তো ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছি। আমি তোমাদের সকলকেই ফিরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছি।" এ কথা বলেই পাশে যে উটটি বসিয়ে রাখা হয়েছিল তার উপর তিনি উঠে বসলেন। উটকে মার দিতেই সে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সে সময় আমার এমন সুযোগ হয়েছিল যে, আমি ইচ্ছা করলে আবু সুফিয়ান (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে একটি তীরের আঘাতেই খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ ছিল যে, আমি যেন নতুন কোন কাজ না করে বসি। তাই আমি এ কাজ হতে বিরত থাকলাম। এখন আমি ফিরে চললাম এবং আমার সৈন্যদলের মধ্যে পৌছে গেলাম।

আমি যখন পৌঁছি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়ছিলেন। চাদরটি ছিল তাঁর কোন এক পত্নীর। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি আমাকে তাঁর দুই পায়ের মাঝে বসিয়ে নিলেন এবং তাঁর ঐ চাদর দ্বারা আমাকে আবৃত করলেন। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করলেন। আর আমি সেখানেই চাদরমুড়ি দিয়ে বসে থাকলাম। তাঁর নামায পড়া শেষ হলে আমি তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। গাতফান গোত্র যখন কুরায়েশদের ফিরে যাবার কথা শুনলো তখন তারাও নিজেদের তলপি-তলপা বেঁধে নিয়ে ফিরে চললো।”

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! ককনে শীত সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন কোন গরম হাম্মাম খানায় রয়েছি। ঐ সময় আবু সুফিয়ান (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) আগুন জ্বেলে তাপ গ্রহণ করছিল। আমি তাকে দেখে চিনে ফেললাম। সাথে সাথে আমি কামানে তীর যোজন করলাম। মনে করলাম যে, তীর ছুঁড়ে দিই। তিনি আমার তীরের আওতার মধ্যেই ছিলেন। আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন কারণই ছিল না।

কিন্তূ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা আমার স্মরণ হয়ে গেল যে, আমি যেন এমন কোন নতুন কাজ করে না বসি যার ফলে শত্রুরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি আমার বাসনা পরিত্যাগ করলাম। যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে আসলাম তার পূর্ব পর্যন্ত আমি কোন ঠাণ্ডা অনুভব করিনি। আমার মনে হচ্ছিল যে, যেন আমি গরম হাম্মাম খানায় আছি। তবে যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺএর নিকট পৌছলাম তখন খুবই ঠাণ্ডা অনুভূত হতে লাগলো। আমি ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺতার চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলেন। আমি সকাল পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺআমাকে এ বলে জাগালেনঃ হে নিদ্রিত ব্যক্তি! জেগে ওঠো।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, যখন ঐ তাবেয়ী বলেনঃ হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহﷺ-কে দেখতাম এবং তাঁর যুগটা পেতাম।” তখন হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেনঃ হায়! যদি তোমার মত আমার ঈমান হতো। তাকে না দেখেই তুমি তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছো! তবে হে আমার প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি যে আকাক্ষা করছে তা শুধু আকাঙ্ক্ষাই মাত্র। সেই সময় থাকলে তুমি কি করতে তা তুমি জানো না। আমাদের উপর দিয়ে কত কঠিন সময় গত হয়েছে!” অতঃপর

তিনি তাঁর সামনে উপরোল্লিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তাতে তিনি একথাও বললেনঃ ঝড় তুফানের সাথে সাথে বৃষ্টিও বর্ষিত হচ্ছিল।”

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথের ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন তখন মজলিসে যারা উপস্থিত ছিলেন। তারা বললেনঃ আমরা যদি সে সময় উপস্থিত থাকতাম তবে এই করতাম, ঐ করতাম।” তাঁদের একথা শুনে হযরত হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ ‘বাহির হতে তো দশ হাজার সৈন্য আমাদেরকে ঘিরে বসে আছে, আর ভিতর হতে বানু কুরাইযার আটশ' জন ইয়াহূদী বিদ্রোহী হয়ে গেছে এবং শিশুরা ও নারীরা মদীনায় পড়ে আছে। এভাবে সবদিক দিয়েই বিপদ লেগে আছে।

যদি বানু কুরাইযা গোত্র এদিকে লক্ষ্য করে তাহলে ক্ষণেকের মধ্যে শিশু ও নারীদের ফায়সালা করে দিবে। আল্লাহর শপথ! এ রাত্রের মত ভীতি-বিহ্বল অবস্থা আমার আর কখনো হয়নি। এর উপর ঝড় বইছে, তুফান সমানভাবে চলতেই আছে, চতুর্দিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, মেঘ গর্জন করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সবই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর ইচ্ছেতেই হচ্ছে। সাথীদেরকে কোথায় দেখা যাবে? নিজের হাতের অঙ্গুলীও দেখা যায় না। মুনাফিকরা বাহানা করতে শুরু করে দিয়েছে যে, তাদের ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পরিবারকে দেখবার কেউ নেই। সুতরাং

রাসূলুল্লাহ ﷺযেন তাদেরকে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকেও ফিরে যেতে বাধা দিলেন না। যেই অনুমিত চায় তাকেই তিনি বলেনঃ যাও, আগ্রহের সাথেই যাও।” সুতরাং তারা এক এক করে সরে পড়ে। আমরা শুধু প্রায় তিনশর মত রয়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাদেরকে এক এক করে দেখলেন। আমার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আমার কাছে শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার না ছিল কোন অস্ত্র এবং ঠাণ্ডা হতে বাঁচবার না ছিল কোন ব্যবস্থা। শুধু আমার স্ত্রীর ছোট একটি চাদর ছিল যা আমার হাঁটু পর্যন্ত পৌছেনি। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন তখন আমি আমার হাঁটুতে মাথা লাগিয়ে কাঁপছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কে? আমি উত্তরে বললামঃ আমি হুযাইফা। তিনি তখন বললেনঃ হে হুযাইফা ! শুন।” তাঁর একথা শুনে আল্লাহর কসম! পৃথিবী আমার উপর সংকুচিত হয়ে গেল যে, না জানি হয়তো তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলবেন। আর দাঁড়ালে তো আমার দুর্গতির কোন সীমা থাকবে না। কিন্তু করি কি? আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ তো? বাধ্য হয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি।”

তিনি (ﷺ) বললেনঃ শত্রুদের মধ্যে এক নতুন ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে। যাও, এর খবর নাও।" আল্লাহর কসম! ঐ সময় আমার চেয়ে অধিক না কারো ভয়-ভীতি ছিল, না আমার চেয়ে বেশী কাউকেও ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ শোনা মাত্রই আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্যে দু'আ করছেন। এটা আমার কানে আসলো। তিনি দু'আ করছিলেনঃ হে আল্লাহ! তার সামনে হতে, পিছন হতে, ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, উপর হতে এবং নীচ হতে তাকে হিফাযত করুন।" তার দু'আর সাথে সাথে আমার অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেনঃ শুন হে হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)! সেখান হতে আমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন কিছু করে বসো না।" এ রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, হযরত হুযাইফা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বলেনঃ ইতিপূর্বে আমি আবু সুফিয়ান (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-কে চিনতাম না। ওখানে গিয়ে আমি এ শব্দই শুনতে পেলামঃ চল, ফিরে চল।" একটি আশ্চর্য ব্যাপার এও দেখলাম যে, ঐ ভয়াবহ বাতাস যা ডেকচিগুলোকে উল্টিয়ে দিচ্ছিল তা শুধু তাদের সেনাবাহিনীর অবস্থানস্থল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আল্লাহর শপথ! তা থেকে অর্ধ হাতও বাইরে যায়নি। আমি দেখলাম যে, পাথর উড়ে উড়ে তাদের উপর পড়ছিল। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন দেখলাম যে, পাগড়ি পরিহিত প্রায় ২০ জন অশ্বারোহী রয়েছেন যারা আমাকে বললেনঃ যাও, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে যথেষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে তিনি পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেছেন।"

এই বর্ণনায় এও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কোন বিপদের সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়া শুরু করে দিতেন। এতে আরো রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ খবর পৌছানো হয় তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এ আয়াতে নিম্ন অঞ্চল হতে আগমনকারী দ্বারা বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে।

মহা প্রতাপশালী আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। এমনকি কোন কোন মুনাফিক তো এটা মনে করে নিয়েছিল যে, এ যুদ্ধে কাফিররাই জয়যুক্ত হবে। সাধারণ মুনাফিকদের কথা তো দূরে থাক, এমনকি মুতাব ইবনে কুশায়ের বলতে শুরু করলো: রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাদেরকে বলেছিলেন যে, আমরা নাকি কাইসার ও কিসরার ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবো, অথচ এখানকার অবস্থা এই যে, পায়খানায় যাওয়াও আমাদের জন্যে কষ্টকর

হয়ে পড়েছে।” এ রকম বিভিন্ন লোকের ধারণা বিভিন্ন ছিল। তবে মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের জয় সুনিশ্চিত।

হযরত আবু সাঈদ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের প্রাণ তো হয়েছে কণ্ঠাগত, এখন আমাদের বলার কিছু আছে কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যা, তোমরা বলো (আরবি)অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মর্যাদা রক্ষা করুন এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করুন।” এদিকে মুসলমানদের এ দু'আ উচ্চারিত হচ্ছিল, আর ঐ দিকে আল্লাহর সৈন্য বাতাসের রূপ ধারণ করে এসে পড়ে এবং কাফিরদের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। (এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রহমাতুল্লাহ) ও ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন))

এই ছিল কাফির মুশরিকদের একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃন্য পরিকল্পনা। মুসলিমদের সবর এবং তাওয়াক্কুল তাদের কে বিজয় এনে দিয়েছিল। কুফফারদের জোট কে করেছিল তছনছ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের উপর এই পরীক্ষা ছিল প্রাণ ওষ্ঠাগত যা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কুরআনে বর্ণনা করেছেন। অতএব মুসলমানদের এখান থেকে ধৈর্য,সবর ,তাওয়াক্কুল এবং বিচক্ষণতার শিক্ষা গ্রহন করতে হবে।

ঈমানদারের পরীক্ষা স্বরুপ বালা মুসিবত স্রোতের গতির মতো তেড়ে আসে

এ সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায় যেমন,

فقد صح أن رجلاً أتى إلى انبي فقال :والله يا رسول الله إني أحبك، فقال له رسول الله "إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه ".

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত , জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন; স্রোত গন্তব্যের দিকে যত দ্রুত ধাবিত হয়, যারা আমাকে ভালবাসে, তাদের দিকে বিপদাপদ তার চেয়েও দ্রুত ধাবিত হয়। (ইবনে হিব্বান আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ: ১৫৮৬)

،وأكثر الناس حبا الله تعالى وللنبيه أكثرهم بالاء في الله ..وأكثرهم اتباعا لمنهاجه وسنته وسيرته وتخلقاً ، كما قال تعالى :قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

আর যারা আল্লাহ ও তার নবীকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, তারাই আল্লাহর পথে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং তারাই তাঁর নীতি, আদর্শ ও জীবনীর সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করে এবং সবচেয়ে বেশি তার চরিত্রে চরিত্রবান হয়। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"

وقال: "أشد الناس بلاء الألنبياء ثم الأمثل فلأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন:

"মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদাপদের সম্মুখীন হন নবীগণ, তারপর তাদের সর্বাধিক অনুসরণকারীগণ, তারপর তারপরের স্তরের লোকগণ... এভাবে। প্রতিটি লোককে তার দ্বীনদারি অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। তাই কেউ যদি স্বীয় দ্বীনে মজবুত হয়, তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়।

আর কেউ যদি স্বীয় দ্বীনে দুর্বল হয়, তাকে তার দ্বীন অনুযায়ীই পরীক্ষা করা হয়। এভাবে একজন বান্দার উপর বিপদাপদ আসতে থাকে, যতক্ষণ না তাকে এ পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সে

পৃথিবীর উপর এমনভাবে হাটতে থাকে, যে তার কোন গুনাহই থাকে না।" (তিরমিজি, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৪৩)

وقال :عن نفسه:"ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل ".

তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন, আমাকে আল্লাহর পথে যত কষ্টের শিকার দেওয়া হয়েছে, কেউ এত কষ্টের শিকার হয়নি। (সিলসিলাতুস সাহিহা ২২২২)

وقال ":كما يضاعف لنا الأجر، كذلك يضاعف علينا البلأ ".

তিনি আরও বলেন: যেমনিভাবে আমাদের বিনিময় বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, তেমনিভাবে আমাদের বিপদাপদও বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। (সিলসিলাতুস সহিহা ২০৪৭)

وقال ":إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤناً نكبة من شوكة فما فوق ذلك، إلا حُطت بها عنه خطيئة، ورفع بها درجة ".

তিনি আরও বলেন; "নিশ্চয়ই নেককারদের উপর কঠিন বিপদ দেওয়া হয়। আর মুমিন বান্দার উপর কাঁটা বা তার চেয়ে নগণ্য পরিমাণ মত বিপদ আসে, তার প্রতিটির জন্য তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।" (তাবারানি, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৬১০)

وقال ":إن عظم الجزاء مع عظم البلأ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى ِ ومن سخط فله السخط

তিনি আরও বলেন; নিশ্চয়ই বড় প্রতিদান বড় পরীক্ষার সাথেই। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। অতঃপর যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিজি, ইবনে মাযাহ, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৪৬)

বালা’ মুসিবত হচ্ছে মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী

বালা’ মুসিবত হচ্ছে মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী। এসম্পর্কিত আরো কিছু আয়াত এবং হাদিস

«الابتالأ هو فرق بين المؤمن والمنافق»

«বিপদ আপদই মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী»

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِينَ

তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (সুরা আলে ইমরান, ১৪০)

وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

আর যেদিন দু’দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ’র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। (সুরা আলে ইমরান, ১৬৬)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ الْعَٰلَمِينَ)10 (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنْ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ)11(

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ’র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ’র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ’র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?

আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফেক। (সুরা আনকাবুত, ১০-১১)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৩১)

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوٰلِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّٰبِرِينَ
الَّذِينَ إِذَآ أَصٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ)156 (أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ (155)
)وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)157

«এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগককে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।

যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জনা এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্’র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।» (সুরা বাকারা , ১৫৫-১৫৭)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَٰمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)13 (أُولَٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
)خٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)14

নিশ্চয় যারা বলে , আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (সুরা আহকাফ, ১৩-১৪)

পরীক্ষায় হিম্মত না হারানো; দুঃখবোধ না রাখা

সব কিছুই তাকদিরের ফায়সালা অনুসারে ঘটবে। তকদীর অনুপাতে ও যা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সে অনুসারেই সব কিছু ঘটে। মুসলিমদের এটাই ধর্ম বিশ্বাস। আল্লাহর ইলমের বাইরে, তার অনুমতি ছাড়া এবং ঐশী পরিকল্পনা ছাড়া এ বিশ্ব জগতে কোন কিছুই ঘটে না।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের মাঝে যে বিপর্যয় আসে তা আমি ঘটানোর পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, নিশ্চয় সে কাজ আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরা আল হাদীদ:২২)

«إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ»

"নিশ্চয় আমি প্রতিটি জিনিসকেই তার পূর্বনির্ধারণী অনুসারেই সৃষ্টি করি।(সূরা আল ক্বামার:৪৯)

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষতি ইত্যাদি কতিপয় জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করব এবং (হে নবী মুহাম্মাদ) আপনি ধৈর্যশীলদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দিন।" (২-সূরা বাকারা: আয়াত-১৫৫)

একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"মুমিনের কাজ বড়ই আশ্চর্যজনক! নিশ্চয় তার সব কাজই তার জন্য কল্যাণকর। যখন তার কোন কল্যাণ হয় তখন শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার আরো কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তার কোন ক্ষতি হয় তখন সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে সে ক্ষতিও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর এমনটি মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্যই হয় না।"

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন তুমি তা আল্লাহর নিকটে চাও, আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন তুমি আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাও। আর জেনে রাখ যে, সব মানুষও যদি কোন বিষয়ে তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা তা করতে পারবে না। তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যলিপিতে যেটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু উপকার করতে পারবে। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করার জন্যও একত্রিত হয় তবুও তারা তা করতে পারবে না, তবে

তোমার ভাগ্যলিপিতে আল্লাহ যেটুকু লিখে রেখেছেন-সেটুকু ক্ষতি তারা করতে পারবে। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং (কালিতে লিখিত) পৃষ্ঠাসমূহ শুকিয়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন-

"এবং জেনে রাখ যে, যা তোমার নিকট এসেছে তা তোমার নিকট না আসার ছিল না এবং যা তোমার নিকট আসেনি তা তোমার নিকট আসার ছিল না।"

অন্য একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"যা তোমার উপকার করবে তার জন্য চেষ্টা কর, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, দুর্বল হয়ো না ও এ কথা বলো না যে, আমি অমুক অমুক কাজ করলে অবস্থা এমন এমন হতো। বরং একথা বল যে, আল্লাহ সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন এবং তিনি যা চান তা তিনি করেন।"

আরো একখানি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"বান্দার জন্য আল্লাহ যে ফয়সালা করেন তা তার জন্য কল্যাণকর।"

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله) কে পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি কারো জন্য উপকারী? তিনি বললেন "হ্যাঁ, তবে এ শর্তে যে, পাপের পর লজ্জিত, অনুতপ্ত, ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও মানসিকভাবে চরম অনুতপ্ত হতে হবে।"

মহান আল্লাহ বলেন-

"এবং এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা:২১৬)

মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চারটি কাজের একটি হলো সবরের তাকীদ করা

بســـــــــــمالله‌الرحمن‌الرحیم

وَٱلۡعَصۡرِ)1 (إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِى خُسۡرٍ)2(إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ
)بِٱلصَّبۡرِ)3

"সময়ের শপথ; নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (সুরা আসর, ১-৩)

ঈমান আনার পর দ্বীনের উপর সবর ও ইস্তিকামাতের বিনিময়ে জান্নাত প্রাপ্তি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া পবিত্র ক্বুরআনে বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَٰمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى
كُنتُمْ تُوعَدُونَ)30 (نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِى الْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ
)فِيهَا مَا تَدَّعُونَ)31

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু।

সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে তোমরা দাবী কর। (সুরা ফুসসিলাত, ৩০-৩১)

সবরকারীকে আল্লাহ সুবহানাহ ভালোবাসেন তার ঘোষণা

সর্বোচ্চ মর্যাদার ঈবাদাহ 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' নিশ্চয়ই কষ্টকর এবং এরজন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ ধৈর্য থাকা, কষ্ট -সহিষ্ণু হওয়া ,সবরকারী হওয়া। সবর করার জন্য আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানে (১৪৬-১৪৮) বলেন,

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّٰبِرِينَ)146 (وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ ۖ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ)147 (فَـَٔاتَىٰهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْءَاخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)148(

«আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্ত ও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মােচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।»(সুরা আলে-ইমরান, ১৪৬-১৪৮)

ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবরের পুরষ্কার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এর উপর নিয়ামাত দান করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

۞وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَٰهِۦمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাক মানবজাতির নেতা করব। (সুরা বাকারা, ১২৪)

ঈমানের পরীক্ষায় সবর না করার পরিণাম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, এবং সবর না করে নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।
সবর হীনতার পরিণাম দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْـَٔاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ’র এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (সুরা হাজ্জ, ১১)

জলন্ত চুল্লির সামনে মুমিনের সবর ও অবিচলতা

গোটা দুনিয়ার মধ্যে বাতিলের দ্বারা মুমিনদের উপর অত্যাচারের সর্বোচ্চ মর্মান্তিক দৃশ্য আসহাবুল উখদুদের ঘটনা হৃদয়কে বিচলিত করে তুলে একি সাথে মুমিনদের ধৈর্য ও সবর রেখে হকের উপর ইস্তিকামাত থাকার প্রেরণা পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমের একটা বর্ননায় একটি ঘটনা তাই সাক্ষ্য দিচছে।

ومن قصة أصحاب الألخدود، أن الطاغية لما رأى الناس قد آمنوا بالله رب العالمين، وحصل ما كان يخشاه ويكرهه ” أمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران،

وقال :من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، أو قيل له :اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام :يا أمه اصبري فإنك على الحق "مسلم.

আসহাবুল উখদুদের কাহিনীতে রয়েছে, ত্বগুত শাসক যখন দেখল, মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনে ফেলেছে এবং সে যার আশংকা করছিল ও যা অপছন্দ করছিল তা-ই ঘটে গেছে, তখন সে সড়কের মুখে মুখে গর্ত খননের আদেশ করল। কথামত গর্ত খুড়ে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হল। তারপর বলল; যে দ্বীন থেকে ফিরে না আসবে, তাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। ফলে তার সৈন্যবাহিনী তাই করতে লাগল।

এক পর্যায়ে একজন মহিলার পালা আসল, তার সাথে ছিল তার ছোট্ট শিশু। তাই মহিলাটি তাতে নিক্ষিপ্ত হতে গড়িমসি করছিল। তখন উক্ত শিশু বলে উঠল: হে মা! অবিচল থাকুন, কারণ আপনি হকের উপর আছেন। (মুসলিম)

এদের ব্যাপারে এবং এদের মত অন্যান্য লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেন:

فيهم وفي أمثالهم يقول تعالى :وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۞

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (সূরা হাজ্জ, ১১)

সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকাটাই বড় সবর

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله، قال :كنا جلوسا عند النبي ، فخط خطا هكذا أمامه، فقال :"هذا سبيل اهلل عز وجل "، وخط خطا عن يمينه، وخط خطأ عن شماله، وقال: "هذه سبل الشيطان ثم وِأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وضع يده في الخط الأوسط ثم تال هذه " الآية :فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হাদিসে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি তার সামনে একটি রেখা আঁকলেন এভাবে। তারপর বললেন; এটা হল আল্লাহর পথ। তারপর তার ডান দিকে একটি রেখা টানলেন

এবং বাম দিকে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন; এগুলো হল শয়তানের পথ। তারপর মাঝের রেখাটিতে তার হাত রেখে তেলাওয়াত করলেন;

অর্থ: "নিশ্চয়ই এটাই আমার সরল পথ। তাই তোমরা এরই অনুসরণ করো। অন্যান্য বহু পথের অনুসরণ করো না। তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তিনি তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা ভয় করো।

وقال تعالى] :إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ [قال أبو بكر الصديق)رض :(.فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "নিশ্চয়ই যারা বলেছে আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর অটল থেকেছে... আবু বকর সিদ্দিক রা: বলেন; অতঃপর তার থেকে ডানে বামে ঘাড় ফিরায়নি। (আল-মুতাওয়া, ৩২/২৮)

নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘায়িত ৯শত বৎসর সবর করেছিলেন

সবরের পরিমাপ করা আসলেই কঠিন। এক কথায় মুমিনদের গোটা জিন্দেগীটাই হতে হবে ধৈর্য আর সবরের বেড়ির মধ্যে অতঃপর রব্বে কারীমের সাক্ষাৎ। সহীহ মুসলিমের একটা হাদিসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখি এতো দীর্ঘ সবরের পথ দুনিয়ার ইতিহাসে আর নাই। এখান থেকে দাওয়াহর ময়দানে একজন দাঈ ইলাল্লাহ'র সবর কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ومن الانبياء .عليهم الصلاة والسلام .من استمر في دعوته السنين الطوال فما آمن معه إلال قليل من الناس، كما قال تعالى عن نوح ، الذي ظل يدعو قومه ما يزيد عن تسعمائة عام، فكانت النتيجة كما قال تعالى] :وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ [هود :بل إن من الانبياء من لا يؤمن به إلا الرجل الواحد، كما قال :"إن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد"

নবীদের মধ্যে এমন অনেক নবীও অতিবাহিত হয়েছেন, যারা দীর্ঘ বছর দাওয়াত চালিয়ে যান। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকই তাদের সাথে ঈমান আনে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নূহ আ: সম্পর্কে বলেন; যিনি তার কওমকে ৯ শত বৎসরের অধিক দাওয়াত দেন। কিন্তু ফলাফল ছিল যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেন , তার সাথে অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল। বরং এমন নবীও অতিবাহিত হয়েছেন, যার সাথে মাত্র এক ব্যক্তি ঈমান এনেছে। যেমন নবী ﷺ বলেছেন; এমন নবীও আছেন, যাকে তার উম্মতের মাত্র একজন বিশ্বাস করেছে। (মুসলিম, সহিহ আল-জামে)

وقال :"أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون، وإنكان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء".

তিনি আরও বলেন; মানুষের মধ্যে সর্বাধিক পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ, তারপর নেককারগণ। আর তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে যতটা আনন্দিত হও, তারা বিপদাপদে ততটা আনন্দিত হয়। (ইবনে মাজাহ, সিলসিলাতুস সাহিহা, ১৪৪)

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম,হে আল্লাহর রাসূল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে কারা? জবাবে তিনি বলেন,নবীগণ। অতঃপর তাদের অনুরূপগণ। অতঃপর তাদের অনুরুপগণ অর্থাৎ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ,এবং পর্যায়ক্রমে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ, বান্দা তার দ্বীনের পরিধি অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে।

অতএব,সে যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে মজবুত হয়,তাহলে তার পরীক্ষাও কঠিন হবে। আর যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে নরম হয় তাহলে তার দ্বীনি পরিধি অনুযায়ী তাকে পরীক্ষা করা হবে।

এভাবে বান্দার নিকট বালা মুসিবত আসতেই থাকবে।(এবং সে ক্ষমাও পেতে থাকবে),যেন সে পাপমুক্ত হয়ে পৃথিবীতে চলতে থাকে। (জামে তীরমিযি: ২৫০৯, ইবনু মাজাহ:৪০৭২)

বিপদ ও ধৈর্য

দুনিয়ার সকল বিপদেরই একটি নির্ধারিত সময় ও শেষ আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটা জানেন। এ কারণে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, সেই বিপদের সমাপ্তির সময় পর্যন্ত সবরের সাথে রবের ফায়সালার অপেক্ষা করা। এর অন্যথায় সে যদি নির্ধারিত সময়ের আগেই অস্থির হয়ে পড়ে নিরাশা করতে থাকে, তবে এটা তাকে কোনো উপকার করবে না।

যেমন, কোনো ভারি ধাতব গোলাকার বস্তু যদি ওপর থেকে নিচে পতিত হয় কিংবা ঘূর্ণন শুরু করে, তবে আর তাকে ঠেকানো যায় না। বরং তখন তার স্থির হওয়া বা গতিহীন হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে হয়। এভাবে একটি নির্ধারিত সময় থাকা সত্ত্বেও যদি বিপদ দ্রুত দূর হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা হয়, তবে এতেও কোনো উপকার হয় না।

সুতরাং উচিত হলো ধৈর্যধারণ করা। যদিও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দুআ করা বৈধ এবং এর মাধ্যমেই উপকার হয়। কিন্তু দুআকারীর জন্য সাড়াদানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। বরং সে তার 'দাসত্ব' বা আনুগত্যকে প্রকাশ করবে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে, প্রার্থনার মাধ্যমে এবং প্রজ্ঞাবান সত্তার ফয়সালা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

আর এদিকে সম্ভাব্য যে অপরাধগুলোর কারণে এই বিপদ এসেছে, সেগুলো বর্জন করবে। কারণ, অধিকাংশ বিপদই হয়ে থাকে শাস্তিস্বরূপ। কিন্তু দ্রুত সাড়াপ্রত্যাশী ব্যক্তি তো প্রতিপালকের অমান্যতা প্রদর্শন করে। এটা বান্দার কাজ নয়। এটা বান্দার জন্য শোভনও নয়। বরং বান্দার কাজ হলো, প্রতিপালকের ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্যধারণ করা।

হ্যাঁ, অধিক দুআ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মিনতি করা তো ভালো কাজ। বরং বিমুখ থাকা- প্রার্থনা না করাই হারাম ও অবাধ্যতা। কিন্তু এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করাও তো তার পরিচালনা-পদ্ধতির মাঝে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চাওয়ার নামান্তর।

দু'আ এর মধ্যেই ও স্থীরতা থাকা চাই ;চাই ধৈর্য্য ধরে ফায়সালার অপেক্ষা করা।নিরূপায়ভাবে মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে নিবেদন করা এবং তাঁর কাছে সাহায্য ও মঙ্গল কামনা করায় সবরের সাথে দুআ। দু'আ-ই ইবাদাহ' অর্থাৎ সব ইবাদতই এক ধরনের দু'আ এবং ‘দু'আ-ই

মাসআলা’। আর ইবাদতের জন্য ধৈর্য ও সবর আবাশ্যক। সব ধরনের বালা- মুসিবতে দুআ ও সবরের ফলে বান্দার জন্য সবকিছুই কল্যাণকর হয়ে উঠে।

ধৈর্যের প্রতিদান

জগতে ধৈর্যের চেয়ে কঠিন কিছু নেই।

কারণ, কখনো ধৈর্যধারণ করতে হয় প্রিয় ব্যক্তির বিচ্ছেদের ওপর কিংবা অপছন্দনীয় জিনিস সয়ে নেওয়ার ওপর। বিশেষকরে ধৈর্যধারণটা কঠিন হয়ে পড়ে তখন, যখন বিপদের সময়টি অতি দীর্ঘ হয় কিংবা উদ্ধারের ক্ষেত্রে নিরাশা এসে যায়।

ঠিক এই সময়গুলোতে এমন কিছু অবলম্বন ও পাথেয় দরকার- যার মাধ্যমে এই কঠিন যাত্রাটা পার করা সম্ভব হয়। পাথেয় অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন,

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদের পরিমাণের দিকে লক্ষ করবে। কারণ, বিপদটি এর চেয়ে আরও বেশি হতে পারত। কিংবা ভেবে নেবে, এরপর আল্লাহ আরও বেশি ভালো প্রতিদান দেবেন। যেমন, কারও সন্তান মারা গেল। কিন্তু আল্লাহর কাছে তো এর চেয়ে আরও উত্তম প্রতিদান রয়েছে। হয়তো সেটা দুনিয়াতেই হতে পারে- তাকে আরও নেককার সন্তান প্রদানের মাধ্যমে। কিংবা এর প্রতিদান হতে পারে আখিরাতে।

তাছাড়া শুধু শুধু চিন্তা-ভাবনা করা এবং এ নিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করে তো কোনো উপকার হয় না। এমন আরও কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে, ধৈর্যধারণ সহজ হয়ে যায়।

ধৈর্যের পথে উপকার ছাড়া কিছু নেই। সুতরাং ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য এই সকল ভাবনায় নফসকে ব্যস্ত রাখা উচিত। এর মাধ্যমে তার বিপদের সময়গুলো সহজে সহনশীলতার সাথে অতিবাহিত হবে এবং কষ্টের আঁধার কেটে সুখময় সকালের উদয় ঘটবে।

ধৈর্য্যের প্রতিফল

সুরা ইউসুফের মধ্যে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনি যা থেকে বিরত থেকেছেন, সেটা এখন মানুষের বর্ণনা এবং তার মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তিনি এত মর্যাদাশীগ ও মানুষের জন্য এখন উত্তম চরিত্রের উদাহরণ হয়ে উঠেছেন অবৈধ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অবৈধ আবেগের ডাকে সাড়া প্রত্যাখ্যান করা মহান এক গুণ। আজ তার ধৈর্যের ঘটনা দিয়ে মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়।

সকল মানুষের উপর তাঁর এই ধৈর্য ও কষ্টস্বীকার একটি গর্বের বিষয় হিসেবে পরিগণিত। কিছু মুহূর্তের ধৈর্যের কারণে নবী ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানবাসী এবং গোটা দুনিয়াবাসীর কাছে হলেন সম্মানিত।

কত স্বল্প সময়ের ব্যাপার ছিল এটা। মুহূর্তের এই ধৈর্যধারণই হয়ে গেল ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সারাজীবনের বিশাল সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। আর তিনি হয়ে উঠলেন অনাগত সকল মানুষের জন্য চারিত্রিক পবিত্রতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

সুতরাং সেই ব্যক্তি, যার কিছুটা সম্মান মর্যাদা ও গর্ব করার বিষয় আছে,নিজের এ ধরনের আবেগঘন মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া তারজন্য নিরাপদ নিরালায় নিজের প্রিয়তম কিংবা প্রিয়তমা- অথবা কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধৈর্যহারা না হওয়া।

মুহূর্তের ধৈর্য কিংবা অধৈর্য পরবর্তীতে জীবনকে আমূল পাল্টে দিতে পারে।

সুতরাং যারা বুদ্ধিমান, তারা দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

বিষয় দুটো হলো, সাময়িক মিষ্টতা ও স্থায়ী ভিক্ততা এবং সাময়িক তিক্ততা ও স্থায়ী মিষ্টতা।

দুনিয়ার মিষ্টতা কিংবা তিক্ততা- দুটোই সাময়িক। আর আখিরাতের মিষ্টতা কিংবা ভিক্তভা দুটোই স্থায়ী। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই সাময়িক মিষ্টতার বিনিময়ে স্থায়ী তিক্ততা গ্রহণ করতে চাইবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার হিসাবের খাতা গোনাহ থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে নিজেকে ঝুঁকিয়ে না দেবে সে তার জীবনের প্রতিটি ধৈর্যের ক্ষেত্রে বহুগুণ লাভ ও অর্জন দেখতে পাবে। আর প্রতিটি প্রবৃত্তির অনুসরণে দেখতে পাবে অনুশোচনার বিষয়।

এ বিষয়ে যতটুকু আলোচনা হলো, প্রবৃত্তির অবৈধ অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বুঝমানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া

মুমিনের ঈমান প্রকাশ পায় তার বিপদ বা কষ্টের সময়। তখন সে বারবার দুআ করতে থাকে। কিন্তু দুআ কবুলের কোনো প্রভাব সে দেখতে পায় না। কিন্তু তাই বলে তার আশা এবং প্রত্যাশাও কমে যায় না। নিরাশার সকল কারণও যদি তার ক্ষেত্রে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তবুও সে নিরাশ হয় না।

কারণ, সে জানে, তার প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কল্যাণের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন। কিংবা তিনি হয়তো এখন তার থেকে ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চান। তার ঈমানের দৃঢ়তা দেখতে চান। এর দ্বারা তিনি তার বান্দার অন্তরের পরিপূর্ণ সমর্পণকে দেখতে চান। তার কাছে যেন বান্দা আশ্রয়ের জন্য ঝুঁকে যায়। আরও বেশি বেশি দুআ ও প্রার্থনা করে।

কিন্তু যে ব্যক্তি দ্রুতই প্রার্থনা কবুল হওয়া দেখতে চায় এবং দ্রুত কবুল না হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এটা হবে তার দুর্বল ঈমানের প্রকাশ। সে ভাবতে থাকে দুআ কবুল হওয়াটা যেন তার অধিকার। সে যেন তার কাজের প্রতিদান প্রার্থনা করছে।

তাঁর উচিত হবে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনার কথা স্মরণ করা! দীর্ঘ ২৮ বছর তিনি পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আশার মধ্যে কোনো হেরফের হয়নি।

আল ক্বুরআনে নবী ইয়াকুব আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেন,
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتينى بهم جميعا انهٗ هو العليم الحكيم (٨٣)

সে বলল, ‘বরং তোমাদের নাফ্স তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে, সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আশা করি, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’। (সূরা ইউসুফ: ৮৩)

এমনিভাবে যখন মুসা আলাইহিস সালাম হারানোর পর তার ভাই বিনয়ামিনও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনও তার আশা রহিত হয়নি।

মূলতঃ ধৈর্যধারণ ও আশা জিইয়ে রাখার এই বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মধ্যে তিনি ইরশাদ করেন-

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ وَ لَمَّا یَاۡتِکُمۡ مَّثَلُ الَّذِیۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِکُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰی یَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰی نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِیۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

নাকি তোমাদের কাছে এসেছে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছ এবং আমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের দৃষ্টান্ত আসবে, যারা তোমাদের পূর্বে বিপর্যয় ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছে এবং কেঁপে উঠেছে, যতক্ষণ না রসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলবে, "কখন?"

(হে মুসলিমগণ।) তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জান্নাতে এমনিতেই প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসুল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?

মনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। [সুরা বাকারা: ২১৪]

এটা তো বিদিত বিষয়- দীর্ঘ কষ্ট ও পরীক্ষার পরে এবং পরিত্রাণের ব্যাপারে

নৈরাশ্যের কাছাকাছি পৌছানোর পরই কেবল রাসুল ও মুমিনদের থেকে এমন কথা প্রকাশ পেয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করছে ততক্ষণ বান্দা ভালোই আছে। তিনি বলেন, আমি নামায পড়লাম

বান্দা যতক্ষণ না তাড়াহুড়ো করছে, ততক্ষণ সে কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।. فلم يستجب لي প্রশ্ন করা হলো, তাড়াহুড়ো বিষয়টা কী? তিনি বললেন, তাড়াহুড়োর বিষয়টি হলো, বান্দা বলতে থাকবে, প্রার্থনা করলাম, কিন্তু কই, আমার ডাকে তো সাড়া দেওয়া হলো না।
এ কারণে কিছুতেই কষ্ট ও পরীক্ষার সময়কে দীর্ঘ মনে করা যাবে না। এবং বেশি বেশি দুআ করার ক্ষেত্রে বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করা যাবে না। কারণ, এটা তো পরীক্ষাই করা হচ্ছে- বান্দা মেনে নিবে কি না? এই ধৈর্যধারণ এবং প্রার্থনাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

মোটকথা, বিপদ যদি দীর্ঘও হয়, তবুও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। কারণ মুমিন কখনো নিরাশ হয় না।
(সহিহ বোখারি; মুসনাদে আহমাদ)

(কিতাব: হৃদয়ের দিনলিপি)

সর্বাবস্থায় সবর সুখের চাবিকাঠি

যদি নিজের বর্তমান সীমার মধ্যে বসবাস না করা হয়, তবে চিন্তা-ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, কাজ কর্ম তালগোল পাকিয়ে যাবে এবং সাথে দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে। একথাটি নিম্নোক্ত হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করে-

«সকাল বেলা সন্ধ্যাকে দেখার আশা করিও না এবং সন্ধ্যাকালে সকালকে দেখার আশা করিও না।»

অতীত ও অতীতের সব ঘটনাকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা উচিত। বিগত জিনিসের চিন্তায় বিভোর হওয়া হলো নিহায়াত পাগলামি। ভবিষ্যত নিয়ে আগাম দুশ্চিন্তায় করা মন্দনীয় । কেননা, ভবিষ্যৎ তো অজ্ঞাত ও অদৃশ্য জগতে আছে; এটা আগমন করার আগেই যেন এটা হৃদয় কে কষ্ট না দেয় বিচলিত না করে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত।

নিন্দা ও সমালোচনায় বিচলিত হওয়ার থেকে সেটা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে হবে; বরং একজন মুমিনের উচিত তার নিজেকে শক্তিশালী মুমিন হিসেবে গড়ে তোলা। ফলতঃ যোগ্যতার মাপকাঠিতে লোকেরা একে অন্যের বিষয়ে সমালোচনায় মত্তো হয়ে উঠে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং ইখলাস সমৃদ্ধ আমালে সালিহ মুমিনদের জীবনকে সুখী করে। আমালে সালিহ এর জন্য প্রয়োজন সবরের নির্যাস।যে ব্যক্তিই শান্তি, প্রশান্তি ও সুখ চায় সে ব্যক্তিই এসব কিছু আল্লাহর যিকিরের মাঝে খুঁজে পেতে পারে।

এটা নিশ্চিতরূপে একথা প্রমাণিত যে, যা কিছু ঘটে থাকে তা এক পূর্বের ফায়সালা অনুযায়ী অর্থাৎ তাকদীর অনুসারেই।ফলে সহজেই একজন মুমিনের হৃদয়ে সহজেই সবর প্রোথিত হয়।

অন্যের থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওয়ার আশা করা মন্দনীয় সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত হতে নিজেকে ইলমের উদ্দেশ্যে তালিম এবং ধৈর্য্যর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেয়া জরুরি

মুসলমানের তাকদীরে যা আছে তা তার জন্য বড়ই কল্যাণকর।আল্লাহর অনুগ্রহ, করুণা, দয়া ও নিয়ামাহ সমূহকে গণনা করার চেষ্টা করা এবং সেগুলোর জন্য রব সুবহানাহ'র শুকরিয়া জ্ঞাপন করা একটি জরুরী।

সবর প্রত্যেক পরিস্থিতি কে ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়ক, ফলশ্রুতিতে একজন মুসলিম ভাবতে পারে অন্য অনেকের চেয়েও সে ভালো আছে। আলহামদুলিল্লাহ।ঈমান বড় এক নিয়ামক যা উপলব্ধি করতে শেখায় প্রতি মুহূর্তেই (আল্লাহর) সাহায্য আসে।

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই দু'আ করা ও সালাত পড়া অধিক ফলদায়ক।বালা মুসিবত তথা দুর্বিপাক হৃদয় কে শক্ত করবে যদি ধৈর্য ধারণ না করা হয়। সবর নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টিয়ে দিয়ে থাকে।

অবশ্যই প্রতিটি দুঃখের পরেই সুখ আছে। অর্থাৎ কুরআনের ভাষায়,প্রত্যেক কষ্টের পরেই আছে স্বস্তি। ধৈর্য্য ধারণের ফলেই তা প্রকৃতপক্ষে অনুভব করা যাবে।ধৈর্য্য হীনতা যেন ধ্বংসের কারণ না হয় সেজন্য ধৈর্য্য ও সবরের অনুশীলন করতে হবে।

সবর আমাদেরকে উপলব্ধি করায় ,নিশ্চয় আমাদের রব মহা ক্ষমাশীল।ধৈর্য্য হীনতার ফলে ব্যক্তি ক্রোধপ্রবণ হয়ে পড়ে।ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে, রাগান্বিত হওয়া থেকে বাঁচতে সবরের অনুশীলন জরুরি।
জীবনে খাদ্য, পানি ও ছায়া (অর্থাৎ গৃহ) থাকলেই যথেষ্ট; সুতরাং অন্য কোন কিছুর অভাবে (অত্যন্ত) অস্থির ও উদ্বিগ্ন হবেন না।

যে সব ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় তার অধিকাংশই ঘটে না। এবং যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের দিকে তাকালে তার নিজের দুর্বিষহ জীবন ও সহজ লাগবে

আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন।আপনার বারবার সেসব দোয়া করা উচিত যেসব দোয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

একজন মুসলিম উৎপাদনশীল কাজে কঠোর পরিশ্রম করবে এবং আলস্যকে বা অলসতাকে দূরে নিক্ষেপ করবে এতেই তার কল্যান।
গুজব ছড়ানো থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা একজন ঈমানদার এর বৈশিষ্ট্য এবং একই সাথে গুজবে কান দেয়া থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা ব্যাক্তির শত্রুর চেয়ে তার স্বাস্থ্যের অনেক বেশি ক্ষতিকর।

যে সঙ্কট, বালা মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন হয় তাতে গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে। মুমিনের জীবন পবিত্র নির্মল হয়ে উঠে।

ধৈর্য্য ও সবরের তাৎপর্য গুরুত্ব ও ফযীলত:

ধৈর্য্য এবং ধৈর্য্যের কঠিন অবস্থা যেরুপ:

আনুগত্যের পথে অবিচল থাকা এবং কুপ্রবৃত্তি ও ভোগ-বিলাস বর্জন করার ব্যাপারে স্বীয় আত্মাকে কাবু ও আয়ত্তাধীন রাখায় হলো ধৈর্য্য।

যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে শত্রুর মোকাবেলায় অনড় থাকা। এটা হল ধৈর্যের কঠিনতম অবস্থা।

ধৈর্যের প্রকারভেদ

ধৈর্যের গুরুত্বের কথা ইসলাম ধর্মে বারবার বলা হয়েছে। তাফসিরে বায়জাবি অনুসারে ধৈর্য তিন প্রকার: ১. 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা। ২. 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ কর্মে কষ্ট স্বীকার করা। ৩. 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া।

কোনো লোক যদি ওপরের পথ ধরে ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে তার জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা আসবে। এই সবরে বা ধৈর্যে কিছু মূল্যবান উপাদান আছে। প্রথমত, অন্যায়-অপরাধ ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকা।

সব রকমের অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও সৎ কাজ করা। ইবাদত ও সৎ কাজ পবিত্রতা এনে দেয়। তৃতীয়ত, প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য ধরে থাকা। সবরে কামিল বা পরিপূর্ণ ধৈর্যই মানবজীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে।

যেকোনো অযাচিত পরিবেশে ও অনাহূত পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ আছে যেমন হজরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে। তিনি নদীর পারে এসে নদী পারাপারের উপায় না দেখে প্রবল বিপদের মুখোমুখি হয়েও ধৈর্য হারাননি। বরং উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কালা কাল্লা! ইন্না মায়িয়া রব্বি ছাইয়াহদিন।' অর্থাৎ, 'কিছুতেই না। আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাদের পথ দেখাবেন।' (সুরা আশ-শুআরা: ৬২)

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পথে সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করে থাকার সময় তাঁর সঙ্গী হজরত আবুবকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহ আনহু-কে এভাবেই আশ্বস্ত করেছিলেন। কোরআন শরিফে তার উল্লেখ করে বলা

হয়েছে, 'যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না কর, (তবে স্মরণ করো) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছিল দুজনের একজন।

অপরজন আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহ আনহু, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, মন খারাপ কোরো না, আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে আছেন। তারপর আল্লাহ তার ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন। আর এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে তিনি তাকে শক্তিশালী করলেন, যা তোমরা দেখনি আর তিনি অবিশ্বাসীদের কথা তুচ্ছ করলেন। আল্লাহর কথাই সবার ওপরে। আর আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।' (সুরা আত- তওবা: ৪০)

আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহ আনহু'র কাছ থেকে একটি হাদিস জানা যায়। আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহ আনহু এর এক ছেলে একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহ আনহু বাইরে গেলেন। সে সময় ছেলেটি মারা যায়। তিনি ফিরে এসে জানতে চাইলেন, ছেলেটি কী করছে?তাঁর স্ত্রী হজরত উম্মে সুলায়ম রদ্বিয়াল্লাহ আনহা বললেন, সে আগের চাইতে শান্ত। এর পর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণের পর উম্মে সুলায়মের সঙ্গ নিলেন। এর পর উম্মে সুলায়ম বললেন, ছেলেকে দাফন করে এসো।

সকাল হলে আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহ আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঘটনাটি বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে ছিলে?তিনি বললেন, হ্যাঁ!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! তাদের জন্য তুমি বরকত দান করো।'

এরপর উম্মে সুলায়ম রদ্বিয়াল্লাহ আনহা একটি সন্তান প্রসব করলেন।আবু তালহা রদ্বিয়াল্লাহ আনহু সেই শিশুটিকে নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলেন। যাওয়ার সময় উম্মে সুলায়ম সঙ্গে কিছু খেজুর দিয়ে দিয়েছিলেন।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটিকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওর সঙ্গে কি কিছু আছে?তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। খেজুর আছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর চিবিয়ে চিবানো খেজুর শিশুটির মুখে দিলেন। এর পর শিশুটির নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। (বুখারি, হাদিস: ৫,৪৭০)

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি এভাবেই ধৈর্য্যের ফল সুমিষ্ট হয়ে থাকে।

সবরের অর্থ ও তার প্রকার

বিপদ-আপদ আসলে ধৈর্যহারা না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা হল সবরের চার প্রকারের এক প্রকার। বিপদাপদ আসলে ধৈর্যহারা হব না। কারণ বিপদাপদ যা আসছে, সব আল্লাহর হুকুমেই আসছে। হয় আমার গোনাহের কারণে আসছে, নয়তো আমার পরীক্ষার জন্য আসছে বা মর্তবা বুলন্দ করার জন্য আসছে। এজন্য তখন কাজ হল আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। হতে পারে, এই বিপদাপদের কারণে আল্লাহ আমার অনেক গোনাহ মাফ করে দেবেন।

যাইহোক, বিপদাপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করা সবরের এক প্রকার। এছাড়াও আরো সবর আছে।

<u>সবরের দ্বিতীয় প্রকার</u>

সবরের আরেক প্রকার হল, নেক কাজে সবর করা। আচ্ছা, নেক কাজ করতে সবর লাগে কি না? লাগে। শীতের ঠাণ্ডাতে ফজরের নামাযের জন্য আরামের বিছানাটা ছেড়ে ওঠা, উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওজু করে মসজিদে যেতে কষ্ট হয় কি না? অনেকসময় এমনিতেও মন চায় না। গতকাল এশার নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করলাম, কিন্তু আজকে আর মন চাচ্ছে না। তো এই যে কষ্ট বা মন না চাওয়া, সেটার ওপর নিজে জয়ী হওয়া এবং আজকের এশার নামাযও মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা।

মোটকথা, জোর করে যে নেক আমলটা করা হয়, কষ্টের পরও করা হয়- এটার নামও সবর।

যে নেককাজ আমার ওপর ফরয ও অবশ্যপালনীয়, সেই নেক কাজ করতে গিয়ে ধৈর্যহারা হলে চলবে না; আমাকে আমলটা করতেই হবে। বিশেষত ফরয-ওয়াজিব কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না। সুন্নতে মুআক্কাদা, যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক তাকিদ করেছেন, সেটাও আদায় করব। হ্যাঁ, মুসতাহাব-নফলের মাঝে ছাড় আছে। কিন্তু কথা হল, কোনো নেককাজের মহব্বত যদি একবার অন্তরে বসে সেটা কি আর কখনো ছোটে? আমাদের যেসব সাথীরা তিন দিনের, দশ দিনের মজা পেয়ে গেছেন, তাদেরকে কি কেউ নাম লেখানোর জন্য হাতে-পায়ে ধরতে হয়, নাকি নিজের থেকেই নাম লেখায়?

<u>সবরের তৃতীয় প্রকার</u>

আরেক সবর হল গোনাহ থেকে বাঁচা। গোনাহ করতে মন চাইলেও ধৈর্য ধরে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। ভুলে একবার হয়ে গেলে বারবার তওবা করতে থাকব। এতে শয়তান ভয় পাবে।

শয়তান ভাববে, এই লোককে গোনাহ করিয়ে লাভ কী? একবার গোনাহ করালে সে তো শত বার তওবা করে! হিসাব-নিকাশ করে শয়তান দেখবে, তার লস ও ক্ষতি হচ্ছে। তাই পরে দেখবেন, সে আর বেশি আসছে না।

তাহলে সবরের তিন প্রকার গেল। বালা-মুসিবতে সবর করা। ধৈর্য ধরে নেক কাজ করতে থাকা। ধৈর্য ধরে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

সবরের চতুর্থ প্রকার

সবরের আরেক প্রকার হল যে কোনো নেককাজকে ভালো থেকে ভালো করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। (সূরা মুলক:২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন দুনিয়া। মানুষ দুনিয়ায় এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা।

অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন।

একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ, পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রহি'মাহুল্লাহ (মৃত্যু:১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আততাহরীর ওয়াততানবীর' কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। (আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]

সবর এর কথা যে কুরআন মাজীদে এভাবে অসংখ্য জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, এ থেকে বোঝা যায় সবর মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা।

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। (আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩)

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা:১৫৫-১৫৬)

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মু‍ুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।
(সূরা আলে ইমরান:২০০)

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। (সূরা বাকারা:২৫০)

চার. যালিম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। (সূরা আল আনআম(৭):৩৪)

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

সবর জ্যোতিস্বরুপ

কেউ কোনে মুসিবতে আক্রান্ত হলে, সে যেনো না বলে যে, যদি এটা না করতাম তাহলে বিপদে পড়তাম না । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لو (যদি) শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে মানুষ যখন মুসিবতে আক্রান্ত হয়। মুসিবতের সময় মানুষের উপর আবশ্যক হলো সবর করা এবং এর বিনিময়ে সাওয়াবের আশা করা।

সহীহ হাদীছে এসেছে, الصَّبْرُ ضِيَاءٌ "সবর জ্যোতিস্বরূপ"। (মুসনাদে আহমাদ, সহীহ মুসলিম হা/২২৩)।

উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبِرِ "সবরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি"।(সহীহ বুখারী, ৬৪৭০)

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দেহের মধ্যে মাথার মর্যাদা যেমন, ঈমানের মধ্যে সবরের মর্যাদা ঠিক সেরকমই। অতঃপর তিনি আওয়াজ উঁচু করে বললেন, জেনে রাখো! যার সবর নেই, তার ঈমান নেই"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সবরের চেয়ে উত্তম অনুদান কাউকে প্রদান করা হয়নি।

এখানে (الصبر শব্দটি صَبَرَ) থেকে গৃহীত হয়েছে।
এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা ও বিরত রাখা। যখন বাধা প্রদান করা হয় ও বিরত রাখা হয় তখন আরবীতে বলা হয় صبر। অধৈযর্তা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফ্সকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুসিবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبر বলা হয়।

সুতরাং সবর তিন প্রকার। আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তা পালন করতে গিয়ে সবর করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার ক্ষেত্রে সবর করা এবং তাক্বদীর অনুযায়ী যেসব মুসিবত আসে তাতে সবর করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা তাগাবুন: ১১)

আলকামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে মুসিবতের সময় বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাক্বদীরকে মেনে নেয়। অন্যরা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসিবতে আক্রান্ত হয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহ নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে অতঃপর সে সবর করে, ছাওয়াব কামনা করে এবং আল্লাহর ফায়ছালার সামনে আত্মসমর্পন করে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত করেন। সেই সঙ্গে দুনিয়ার সম্পদ থেকে যা তার হাত ছাড়া হয়ে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে হিদায়াত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করেন। কখনো কখনো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া জিনিস ফেরত দেয়া হয়।

সাঈদ ইবনে জুবাইর রহি'মাহুল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন", এর অর্থ হলো হাতছাড়া হওয়া জিনিস কেবল সে আল্লাহ তা'আলার কাছেই ফেরত চায় এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন পাঠ করে।

উপরোক্ত আয়াতে দলীল পাওয়া যায় যে, আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ধৈর্যধারণ করা অন্তরের হিদায়াত লাভের মাধ্যম। মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সবরের প্রতি মুহতাজ। আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়ন করা এবং তার নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তার নফসকে ধৈর্যধারণ করার উপর বাধ্য করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বান্দা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"হে নবী! প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে মানুষকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই অধিক জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কারা সঠিক পথে রয়েছে, এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে ঠিক ততটুকু গ্রহণ করবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্যধারণ তো হবে আল্লাহর সাহায্যেই"। (সূরা আন নাহাল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষের তরফ থেকে যেসব যুলুম-নির্যাতন আসে তাতেও সবর করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা লুকমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

"হে বৎস! যথারীতি সালাত কায়েম করো। সৎকাজের নির্দেষ দাও, অসৎকাজে বাধা দান করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ"। (সূরা লুকমান: ১৭)

পার্থিব জগতে মুমিন বান্দা যেসব মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাক্বদীরকে মেনে নিবে। বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিজের নফ্সকে বিরত রাখবে। বিশেষ করে যখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এটি আকীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করা এর সুফল। মুসিবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আকীদাকে নষ্ট করে ফেলে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اِثْنَتَانِ فِيْ النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি মন্দ স্বভাব রয়েছে যা দ্বারা তাদের কুফুরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা"।(সহীহ মুসলিম হা/৬৭)

এ দু'টি স্বভাব কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা জাহেলী যামানার লোকদের স্বভাব ছিল। তবে যার মধ্যে কুফুরীর কোনো স্বভাব পাওয়া যায় সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যায়না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:ليس بين العبد وبين الكفر أوالشرك إلا ترك الصلاة এর মধ্যে আলিফ-লামযুক্ত মারেফা (নির্দিষ্ট) الكفر শব্দটি এবং আলিফ-লাম ছাড়া নাকেরা (অনির্দিষ্ট) كفر শব্দটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেখানে كفر শব্দটির সাথে আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে الكفر হবে, সেখানে উদ্দেশ্য হবে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাওয়া। আর আলিফ-লাম ছাড়া আসলে সেরকম অর্থ হবে না এবং সেই কুফুরী মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"যে ব্যক্তি মুসিবতে পড়ে স্বীয় গালে চপেটাঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। (বুখারী, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুসিবতে পড়ে গাল চাপড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ "জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে" এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: জাহেলী যামানার চিৎকার বলতে এখানে জাতীয়তাবাদ এবং গোত্র প্রীতির দিকে আহবান করার কথা বলা হয়েছে। এমনি মাযহাব, দল এবং শাইখদের জন্য গোঁড়ামি করাও জাহেলিয়াতের আহবানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কোনো শাইখকে অন্য কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে তার দিকে আহবান করা, এর উপর ভিত্তি করেই কাউকে বন্ধু বানানো, কাউকে শত্রু বানানো। এ সবগুলোই জাহেলিয়াতের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও মুসীবত দ্বারা আক্রান্ত করে থাকেন।

(১) এর মাধ্যমে মানুষের গুনাহ-খাতা মাফ হয়। আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“আল্লাহ তা‘আলা যখন তার কোনো বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া হতে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেন”।(তিরমিযী,সিলসিলা সহীহা, হা/১২২০)

ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাসান বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, বিপদ-আপদ এক প্রকার নিয়ামত। কেননা এটি বান্দার গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়। আর এটি সবরের আহবান জানায়। সবর করলে সাওয়াব প্রদান করা হয়। মুসিবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, তার জন্য নতি স্বীকার করায় এবং সৃষ্টি থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ধাবিত করে। এ ছাড়াও মুসিবতের মাধ্যমে আরো অনেক স্বার্থ হাসিল হয়।

সুতরাং বালা-মুসিবতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা গুনাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি মিটিয়ে দেন। এটি একটি বিরাট নিয়ামত। সুতরাং মুসিবত সমস্ত সৃষ্টির জন্যই বিরাট একটি রহমত ও নিয়ামত। কিন্তু বিপদগ্রস্থ বান্দা বিপদে পড়ে পূর্বের চেয়ে বড় গুনাহয় লিপ্ত হলে বান্দা দীনের দিক থেকে যে ক্ষতির মধ্যে পড়ে, সে কারণে আপদ-বিপদ তার জন্য ক্ষতিকর হয়। কেননা কতক মানুষ বালা- মুসিবতে পড়ে যখন ফকীর হয় অথবা অসুস্থ হয় কিংবা ব্যথিত হয়, তখন সে মুনাফেকী করে, অধৈর্য হয়, তার অন্তর অসুস্থ হয় এবং তার থেকে প্রকাশ্য কুফুরী দেখা দেয়। সেই সঙ্গে সে বেশ কিছু ওয়াজিব আমলও ছেড়ে দেয় এবং এমন কিছু হারাম কাজে লিপ্ত হয়, যা তার দীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুসিবতের কারণে যে ফলাফল অর্জিত হয়, তা বান্দার জন্য ভালো হয়। বিশেষ করে যখন সে দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পড়া থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু নিছক মুসিবত ভালো নয়; বরং ভালো ফলাফল অর্জিত হওয়ার দিক থেকে ভালো।

যেমন মুসিবতে পড়ে কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারলে ও আনুগত্যের পথে অগ্রসর হতে পারলে তার জন্য মুসিবত দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। সুতরাং মুসিবত সৃষ্টি করা যেহেতু আল্লাহর কাজ সে হিসাবে সেটা সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমত স্বরূপ। এর কারণে আল্লাহ তা‘আলা প্রশংসিত হন। বালা- মুসিবতে পড়ে যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তার জন্য তা দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। বালা-মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হওয়ার সাথে সাথে সেটা রহমত স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে সে প্রশংসার পাত্র হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

"তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত"। (সূরা আল বাকারা: ১৫৭)

সুতরাং মুসিবত গুনাহ মাফের কারণ এবং বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। যেসব ক্ষেত্রে সবর করা ওয়াজিব সেসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে তার জন্য উপরোক্ত ফযীলত অর্জিত হয়। পৃথিবীতে বালা- মুসিবত ও আপদ-বিপদ প্রেরণের পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত হলো এগুলোর মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান কে সবর করে এবং সন্তুষ্ট থাকে আর কে অসন্তুষ্ট হয় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতিও রয়েছে অসন্তুষ্টি"।(তিরমিযী, হা/২৩৯৬)

ইমাম তিরমিযী রহি. হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাসান বলেছেন।

মুসিবতে পড়ে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো বান্দা তার ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবে, আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবে এবং তার নিকট ছাওয়াব কামনা করবে। আর তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট না থাকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থা ও পরিচালনাধীন কোনো জিনিষের প্রতি অসন্তুষ্ট হলো, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অসন্তুষ্টি রয়েছে।

এ হাদীছে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বান্দার কর্ম যেমন হয়, ফলাফল তেমনই হয়ে থাকে। এতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে অন্যান্য ছিফাতের মতই সন্তুষ্ট হওয়া বিশেষণ সাব্যস্ত। এখান থেকে বালা- মুসিবত ও আপদ-বিপদ আসার পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত থাকার কথাও জানা গেল। সে সঙ্গে ক্বদ্বা ও ক্বদর তথা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ এবং ফায়ছালার কথাও জানা গেলো। তার নির্ধারণ অনুপাতেই

বিপদ-আপদ ও মুসিবত আসে। মুসিবতের সময় সবর করা, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, এবং তার উপর ভরসা করা আবশ্যক।

মোটকথা সমস্ত বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর বিষয় প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে আল্লাহ তা'আলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। কেননা এর পিছনে শুভ পরিণাম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন''। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

এ রকম আরো দলীল রয়েছে, যাতে সবরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মুমিন বান্দার রয়েছে এর বিশেষ প্রয়োজন। কেননা সবর মুমিনের আকীদাকে শক্তিশালী করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সবর করা এবং আখিরাতে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমল করার তাওফীক দেন।

কুরআনে আলোকে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ.

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। (সূরা আহকাফ (৪৬):৩৫)

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান (৩):২০০)

ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। (সূরা বাকারা (২):১৫৩)

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন

الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। (সূরা বাকারা:১৫৬-১৫৭)

তিনি আরো বলেন

قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। (সূরা আ'রাফ (৭) : ১২৮)

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। (সূরা নাহল (১৬) : ৯৬)

তিনি আরো বলেন

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। (সূরা রা'দ :২২-২৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে

اُولٰٓىِٕكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (সূরা কাসাস(২৮): ৫৪)

তিনি আরো বলেন

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ.

আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে যখন তারা সবর অবলম্বন করলএমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত।(সূরা সাজদা(৩২):২৪)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর ও ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবর ও ধৈর্য হল আলো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যাবতীয় অর্থেই সবরকারী ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় পর্ব

বালা মুসিবতের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারণ

বালা মুসিবত ও বিপদ আপদ আপতিত হয় শাস্তিস্বরূপ:

দ্বিতীয়ত বালা-মুসিবত ও আপদ আপতিত হয় শাস্তিস্বরূপ। বান্দার নিকট যে বালা-মুসিবত আসে তা তাদের গুনাহের কারণেই আসে।

“তাদের নিজেদের অপকর্মের কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে বিভিন্ন শাস্তি দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমাদের ওপর যেসব বিপদ আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন"(সূরা আশ শুরা:৩০)

হাফিজ ইবনু কাসির রহ, বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিকট যে বিপদই আসুক না কেন, তা তোমাদের অনিষ্টের কারণেই এসে থাকে আর , তিনি মহান আল্লাহ অনেক কিছুই অর্থাৎ অপরাধ ও অনিষ্ট ক্ষমা করে দেন। এই অনিষ্টের কারণে তোমাদেরকে বদলা দেন না বরং তা মাফ করে দেন(তাফসিরে ইবনু কাসির:৪/১২২)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন
“জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে"(সূরা আর রুম:৪১)
তরাং, মানুষ এর ওপর যে বিপদাপদ বা বালা মুসিবত আসে তা তাদের হাতে অর্জিত অপকর্মের কারণেই আসে।

গুনাহের কারণেই বালা মুসিবত আসে

জ্বীন ও মানুষকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জ্বীন ও মানুষ মহান আল্লাহর দেয়া বিধানে জীবন যাপন করবে। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। এই পৃথিবীতে চলতে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আনন্দ বেদনা, আরাম কষ্ট এগুলোর মুখোমুখি হতে হয়। কখনো যে আনন্দে থাকে কখনো তাকে পেরেশানী কষ্ট কাবু করে ফেলে। এই কষ্ট পেরেশান, বালা মসিবত কখনো তার

অর্জিত কামাই হিসেবে তাকে পাকড়াও করে, যাতে সে মহান রবের দিকে ফিরে আসে। কখনো মহান রবের পক্ষ থেকে তাকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য, তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষা হিসেবে তার কাছে আসে।

মহান আল্লাহ বলেন, তোমাদের উপর যে বিপদ মুসিবত আপতিত হয় তা তোমাদের হাতের কামাইয়ের কারণেই আসে। আর তিনি অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন। (সুরা শুরার:৩০)

মানুষের কৃত কর্মের কারণেই জলে এবং স্থলে মহা দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। যাতে তাদের কোন কোন কাজের স্বাদ তিনি তাদেরকে আস্বাদন করান। যাতে তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে।(সুরা রূমের ৪১)

আর তোমার যা অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজের কারনেই।(সুরা নিসার: ৭৯)

অতঃপর আমি তাদের (অবাধ্যতার কারণে) তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ দুর্দশা কষ্টে আক্রান্ত করলাম। যাতে তারা অনুনয় বিনুনয় এর নীতি অবলম্বন করে। (সুরা আনআমের:৪২)

কাজেই যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হলো তখন তারা কেন বিনম্র হল না? বরং তাদের মন আরো বেশি কঠিন হয়ে গেল এবং শয়তান তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে তোমরা যা করছ ভালই করছ।(সুরা আনআমের: ৪৩)

আমি তাদেরকে আমর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছি। তখনও তারা নিজ প্রতিপালকের সামনে নত হয়নি এবং তারা কোন প্রকার অনুনয় বিনুনয় করেনি। (সুরা মুমিনুনের ৭৬)

তারা কি লক্ষ্য করে না, তারা প্রতি বছর দুই বার পরিক্ষার সম্মুখীন হয়। তবুও তারা তাওবা করেনা এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা।(সুরা তাওবার:১২৬)

আমাদের কৃতকর্মের কারণেই মহান রব আমাদের নিকট থেকে তাঁর নিয়ামত কেড়ে নেন, বালা মসিবত, বিপদ আপদ, জুলুম নির্যাতন, নিপিড়ন, ক্ষুধা দারিদ্র চাপিয়ে দেন।

এই ব্যাপারে হাফিজ ইবনুল ক্বাইয়্যিম رحمه الله বলেন, গোনাহের শাস্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লাহর নিয়ামাত দূর হয়ে যায় এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি আপতিত হয়। অতএব গুনাহ ব্যতিত বান্দার নিকট থেকে নিয়ামত দূর হয় না।

আলী রদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, গোনাহ ও পাপাচার ব্যতিত কোন বালা মুসিবত আসে না। তাওবাহ ব্যতিত কোন বিপদ দূর হয় না।

ইবনে সাদ রাহঃ আবু মুলাইকাহ রাহঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহ আনহা যখন মাথা ব্যথা অনুভব করতেন, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়ে বলতেন, আমার গুনাহের কারণে এই ব্যথা। আর আল্লাহ যা মাফ করেন তা তো অনেক।

ইবনে আউন রাহ. বলেন, ইবনে শিরিন রাহ. যখন ঋণের ভারে আক্রান্ত হন এবং এই ঋণের কারণে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি বলেন আমি এই চিন্তাকে চিনি ও জানি, আমার পাপের কারণে আমি চল্লিশ বছর যাবত এই ঋণে আক্রান্ত হয়ে আছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পূর্বের অনেক জাতিকে গোনাহের কারণে পাকড়াও করেছেন এমনকি নবী আ. গনের অনুসারী ব্যতিত সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন নুহ আ. সময়ের নাফরমানদের মহান রব প্লাবনে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। হুদ আ. কাউমকে প্রবল ঝড় ঝঞ্জা দ্বারা ধ্বংস করেছেন। সালিহ আ. এর নাফরমান কাউমকে ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস করেছেন। লূত আ. এর কাউমকে মহান আল্লাহ জমিন উল্টিয়ে দিয়ে আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

ইমানদারগনের উপরও তাদের পাপের জন্য শাস্তি আসে। মহান আল্লাহ চান প্রত্যেক ইমানদের পাপ মুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করুক। তাই বালা মুসিবত, বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে তার পাপ মুক্ত করাতে চান। একজন মুমিন সদা সতর্ক থাকবে। তার উপর কোন বিপদ এসে পরলে সে সচেতন হয়ে যাবে। সে খুঁজতে থাকবে তার দ্বারা কি কি পাপ সংঘটিত হয়েছে। পাপ সমূহ থেকে সে আন্তরিক তাওবা করবে। বিপদ আসার পর একজন মুমিন যদি তার পাপগুলো খোজে বের করতে পারে। তাহলে সে তাওবাও করতে পারবে। সে যদি তাওবা করে, তবে তার পাপ মাফ হয়ে যাবে। তার বিপদ মুসিবত দূর হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের জন্য সে সতর্ক সচেতন হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা সুরা আনফালের ৩৩ তম আয়াতে বলেন, আর আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না আর যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে তাওবা করতে থাকবে এমতাবস্থায়ও আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না।

ইমাম আহমাদ ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার নিকট ইস্তিগফার করবে ততক্ষণ সে আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

শাস্তি এবং পরীক্ষা দুটোর প্রেক্ষাপট দুটি, প্রতিষেধকও ভিন্ন। শাস্তির কারণ হল গুনাহ তার প্রতিকার ইস্তিগফার এবং পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া। পরীক্ষার কারণ হল ইমান আমল যাচাই

এবং মর্যাদা বৃদ্ধি, ধৈর্য্যরে পরীক্ষা। তার প্রতিষেধক হল ধৈর্য্য এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

মহান আল্লাহ তায়ালা সুরা বাকারার মধ্যে বলেন, আর আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত নিশ্চিত পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের ক্ষতি, জীবনের ক্ষতি, ফল ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর হে নবী আপনি ধৈর্য্যশীলদের সুসংবাদ দিন।(সুরা বাকারার ১৫৪)

কোন ব্যক্তি যদি প্রথমেই নিজেকে পরীক্ষার কাতারে ফেলে দেয় এটা শয়তানের একটি প্রতারণা। ফলে সে তার অপরাধ খোঁজার প্রয়োজন অনুভব করবে না। নিজেকে সে অনেক উঁচু স্তরের মনে করবে। কারণ সে এখন পরীক্ষার্থী। তার গুনাহের কথা স্মরণ হবে না। সে তার তার জিন্দেগী যাচাই করে দেখবে না। সে তার জীবন যাপনের দিকে তাকাবে না। যে তার কোন ভূল, অপরাধ আছে কি না বা হচ্ছে কি না?

এখন আমার অনেক গুনাহ আমাকে বিপদে পাকড়াও করেছে। আমি ভাবছি আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন। আসলে বিষয়টা কেমন হয়ে যাচ্ছে না?

তাই আমাদের পূর্ববর্তীগন বিপদ আসলে নিজের গুনাহ খোঁজতেন, ইস্তিগফার করতেন। আর ইস্তিগফার নিশ্চয়ই সবর সালাতের বিপরীত নয়।
আজ ইমানদারদের চতুর্দিকে জুলুমের করালগ্রাস। ইমানদারগন ভাবছেন, এটা তাদের পরীক্ষা।

ফলে এতো বিপদের পরও আমার আমল আখলাক পরিবর্তন হচ্ছে না। কারণ আমরা নিজেকে পরীক্ষার্থী ভাবছি। গুনাহগার ভাবতে পারছিনা। তাওবা ইস্তিগফার করাও আমার ভাগ্যে জুটছে না। কারণ আমি নিজেকে শয়তানের প্রতারণায় পড়ে গুনাহগার ভাবতে পারছিনা। ফলে বছরের পর বছর জুলুম নির্যাতনের স্বীকার হয়েও ধৈর্য্য ধারণ আর সালাতের মাধ্যমে মহান মালিকের সাহায্য চেয়েও আমরা নির্যাতিতই রয়ে যাচ্ছি। কারণ আমাদের রোগ একটি আর ঔষধ গ্রহণ করছি অন্য রোগের। ফলে রোগ বালাই আরো বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের মুরুব্বিগন, দায়ীগনও অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের শিকার।

অতএব সবার আগে নিজেদের গুনাহগুলো তালাশ করা উচিত। গুনাহগুলো চিহ্নিত করে আল্লাহর কাছে খালেস ভাবে ইস্তেগফার করা উচিত। নিজেদের সংশোধন করা উচিত। তাহলে পরিবর্তন আসবেই আসবে। নতুবা যুগ যুগ অপেক্ষা করলেও আশানুরুপ কোন ফলাফল আসার সম্ভাবনা নেই। কেননা এটা একপ্রকার যোগ্যতা অর্জন না করেই নিজেকে পরীক্ষার্থী ভাবার শামিল।

আরো যে যে অপকর্মের জন্য বালা-মুসিবত আবির্ভূত হয়

আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী,

মানুষের উপরে যুলুম-নির্যাতন করা,

অধিক পাপাচার করা ও সৎকাজের আদেশ কম করা,

অবাধ্যতা ও অহংকার করা,

মিথ্যাচার করা,

আল্লাহ প্রদত্ত নি‘মাতের অস্বীকৃতি,

দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও কৃপণতা,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা,

সলাত পরিত্যাগ করা,

যাকাত অস্বীকার করা,

জিহাদ পরিত্যাগ করা,

অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো,

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা,

সূদ-ঘুষ আদান-প্রদান করা বা হারাম ভক্ষণ করা, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা না করা ইত্যাদি কারণে মানুষের উপরে বালা-মুসিবত নেমে আসে।

গুনাহ-পাপাচারের জন্যই বালা মুসিবতের আধিক্য

কোনো মানুষই চায় না তার জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসুক। চায় না তাকে দুঃখ স্পর্শ করুক কিংবা স্পর্শ করুক হতাশা ও দুশ্চিন্তা। কিন্তু অমোঘ বাস্তবতা রুখবে কে? তাই সফলতার পাশাপাশি মানুষকে ব্যর্থতাও দেখতে হয়। সুখের সাথে মেনে নিতে হয় দুঃখকেও। না চাইলেও সয়ে যেতে হয় দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা।

জীবনের এইসব ক্ষেত্রে মানুষ সবসময়ই যে নীতি-আদর্শে অবিচল থাকতে পারে এমন নয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সে সরে যায় করণীয় থেকে। লিপ্ত হয়ে পড়ে নিষিদ্ধ কিংবা অনুচিত নানা কাজে। এক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব দুর্বলতা তো আছেই। আরও আছে গাফিলতি ও অবহেলা, প্রবৃত্তি ও মন্দপ্রবণতা, আছে দৃঢ়তা ও অবিচলতার অভাব। উপরন্তু ইবলিস শয়তান তো আছেই। আছে তার ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণতা।

মানুষের এইসকল অবস্থা, স্বভাবজাত দুর্বলতা, অবহেলা, মন্দপ্রবণতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণার কথা খুব ভালোভাবেই জানেন তিনি, যিনি সকলের খালিক ও স্রষ্টাএবং মালিক ও সর্বাধিকারী। তাই খুব সহজ ও সুন্দর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রেখেছেন তিনি। দিয়েছেন উদ্ধারকারী সহজ মাধ্যম এবং প্রতিষেধমূলক সহজ প্রক্রিয়া।

গুনাহের প্রতিবিধান তাওবায়

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত গোনাহের প্রতিবিধান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করবে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করবে, তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে— সে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা নিসা (৪) : ১১০

এখানে মন্দ কাজ তথা ছোট ছোট গোনাহ এবং নিজের প্রতি জুলুম তথা বড় ধরনের গোনাহÑ উভয়টির ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা। বলা হয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ বান্দা কোনো ভুল, অপরাধ বা সীমালঙ্ঘন করলেও তার প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ার আচরণ করেন। ক্ষমাগুণ প্রকাশ করেন। তাই দৃঢ় আশা করা যায় যে, তিনি বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন।

বাস্তবে সুস্থ বিবেকের অধিকারী কোনো মানুষই চায় না খারাপ হতে। চায় না মন্দ কাজ করতে কিংবা অপরাধী হতে। কিন্তু মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণে শিথিলতা এবং নফস ও শয়তানের প্রবঞ্চনা তাকে এসবে লিপ্ত করে ফেলে। তাছাড়া দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, এখানে ভালো ও মন্দ উভয় কাজের শক্তি দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছে। এরপর ভালো ও নেক কাজে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। মন্দ ও গোনাহের কাজে ঘোষণা করা হয়েছে শাস্তি। সেই শাস্তি থেকেই বাঁচার উপায় হল তাওবা ও ইস্তিগফার।

অন্য একটি আয়াতে আরও উদার-ব্যপ্ত ঘোষণা এসেছে। এসেছে অভয় ও আশ্বাসবাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ۭ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আপনি বলে দিন, হে আমার সেই বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার:৫৩)

গুনাহ হয়ে গেছে! নিজের প্রতি অবিচার করেছ! সীমালঙ্ঘন করেছ! তবু নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এমন অভয় ও আশ্বাসবাণী পাওয়ার পর একজন মুমিনের হৃদয়ে কী আস্থা ও শক্তি অনুভূত হয় তা খুব সহজেই অনুমেয়।

তাওবার প্রতি উৎসাহ এবং ইস্তিগফারের ফায়েদা

শুধু তাই নয়। তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি তিনি আলাদাভাবেও উৎসাহ দিয়েছেন। নির্দেশ করেছেন ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে। ইরশাদ হয়েছে—

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰي مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

এবং দ্রুত অগ্রসর হও তোমার রবের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের (প্রশস্ততার) ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান:১৩৩)

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করতে পার এবং যদি আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানী জুটে যায় তাহলে সেই জান্নাত পেতে পার, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের (প্রশস্ততার) ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। মোটকথা, আল্লাহর ক্ষমা লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল তাওবা। আর সেটি তো মুত্তাকীদেরই পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

তাওবা-ইস্তিগফারের বিভিন্ন ফায়েদার কথাও উল্লেখিত হয়েছে কুরআন মাজীদে। যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ভাষায় ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا،يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، ◌ّ◌َ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

আমি বলেছি, তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যানরাজি আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদ-নদী।(সূরা নূহ: ১০-১২)

অর্থাৎ ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে এইসব বিষয় লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন। আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং বাগ-বাগিচা ও নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন।

স্পষ্ট কথা যে, এগুলোর প্রত্যেকটিই এমন, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও জগৎ প্রায় অচল। সেগুলোই খুব সহজে লাভ হতে পারে ইস্তিগফারের মাধ্যমে।

গোনাহের প্রভাব

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলো অবশ্যই মানুষকে আনন্দিত করে। হৃদয় ও মনে উদ্যম ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ভাব ও ভাবনায় আশ্বাস ও সান্ত্বনার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। ফলে যে কারও কল্পনায় বিষয়গুলো জাগরূক থাকলে গোনাহ হওয়া মাত্রই সে অবনত হবে। তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। আল্লাহ তাআলাও তাঁর দয়া ও ক্ষমাগুণে তাকে মাফ করে দেবেন।

কিন্তু এর বিপরীতে আরেকটি বিষয় আছে, যা খেয়াল রাখা খুব জরুরি। কুরআন মাজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে সে বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করেছে, তার কারণে জলে স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (সৎপথে) ফিরে আসে।

(সূরা রূম:৪১)

অর্থাৎ মানুষের জীবনে যেসব বিপদ ও মসিবত এবং দুর্যোগ ও দুর্দশা আসে সেগুলো তারই কৃতকর্মের ফল; গুনাহ ও পাপাচারের পরিণতি।

অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰي دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

আর আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) সেই বড় শাস্তির আগে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে। (সূরা সাজদা:২১)

এখানে الْعَذَابِ الْأَدْنٰي (লঘু শাস্তি) বলে দুনিয়াবী শাস্তি তথা রোগ-শোক, আপন-বিপদ ও বালা-মুসিবতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গোনাহের কারণে আখেরাতের শাস্তি তো আছেই; দুনিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের মাধ্যমে সেই গোনাহের শাস্তি দেওয়া হবে। (দ্রষ্টব্য, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৬৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ .

তোমাদের উপর যে মুসিবত আসে, তা তোমাদেরই হাতের কর্মের ফলে। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরাহ: ৩০)

বোঝা গেল, অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার পর আরও যা কিছু রয়ে যায় সেগুলোর কারণেও বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মুসিবত আসে। অর্থাৎ কৃত গোনাহ ও অপরাধের সবগুলোর জন্য বান্দা হয়তো তাওবা-ইস্তিগফার করেনি; অথবা করেছে, কিন্তু তার সব তাওবা কবুল হয়নি।

দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মুসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবেই এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে, যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে, সাধারণ বালা-মুসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা ও

ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোনো কারণঘটিত বিষয়। (তাওযীহুল কুরআন, সূরা রূম : ৪১)

উল্লিখিত একটি আয়াতে যেমন ছোট বড় গোনাহের প্রসঙ্গ এসেছে, অন্য একটি আয়াতে এসেছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোনাহের কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ.

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ ছেড়ে দাও। যারা গোনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।
(সূরা আনআম: ১২০)

প্রকাশ্য গোনাহ হল সেইসব গোনাহ, যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে। যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি। আর গোপন গোনাহ হল সেইগুলো, যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি।

আয়াতে উভয় প্রকার গোনাহের শাস্তি শীঘ্রই দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে ভয়ানক সতর্কবার্তা উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে তাদের কৃত অন্যায় ও অপরাধের কারণে যেভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তাদের বর্তমান উত্তরসূরিকেও সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথেও এমনটি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ.

যারা কোনো ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কি এই শিক্ষা লাভ হয়নি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করতে পারি? এবং (হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দিতে পারি, ফলে তারা (কোনো কথা) শুনতে পাবে না?
(সূরা আরাফ : ১০০)

কোনো গোনাহ করার সময় কি মনে থাকে একথা? উপলব্ধির সাথে একথা মনে রাখতে পারলে বাস্তবেই গোনাহ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। এখানে গোনাহের শাস্তির কথা তো আছেই, আরও আছে হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে এমন বিষয় থেকে রক্ষা করুন।

বিপদ আপদ বা বালা মুসিবতে নিপতিত হলে আমাদের করণীয় কি?

তাকদীরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মনে করা যে, আমার ওপর যে বিপদ এসেছে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

পৃথিবীতে (সামগ্রিকভাবে) অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে আমি তা সংঘঠিত করার পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ"(সূরা হাদীদ:২২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন
قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ
বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য (তাকদীরে) যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।(সূরা আত তাওবা: ৫১)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের অন্তরের কুটিলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মুসলিমদের বিজয়, সাহায্য, কল্যাণ ও উন্নতি লাভে তারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, আর আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিমদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা মনে খুবই আনন্দ লাভ করে এবং নিজেদের চতুরতার প্রশংসা করে। তারা বলেঃ এই কারণেই তো আমরা তাদের থেকে দূরে রয়েছি।" এই বলে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা ঐ মুনাফিকদেরকে উত্তর দাও- দুঃখ ও অশান্তি আমাদের তকদীরের লিখন এবং আমরা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার অধীন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আমরা মুমিন, আর

মুমিনদের ভরসা আল্লাহর উপর। তিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কার্যসম্পাদনকারী ।(তাফসিরে ইবনু কাসির)

বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।
ক. বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয়
খ. বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয়।

ক. বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় :

মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললে তাদের উপরে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে বালা-মুসিবত নেমে আসবে না। বালা-মুসিবত যাতে না আসে সেজন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা : আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আববাস রদ্বিয়াল্লাহ আনহু-কে বলেন,

«يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.»

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহলে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং

লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৬-৩১৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

«احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»،

'তুমি আল্লাহর বিধান হিফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখ, বিপদের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবেন'।(হাকিম হা/৬৩০৩; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৫, সনদ সহীহ)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : সচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

«فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ».

অর্থাৎ «অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকটে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। অতঃপর তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। এমনকি তাঁর শংকা দূর হল। তখন তিনি খাদীজা রদ্বিয়াল্লাহ আনহা-এর নিকটে ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা রদ্বিয়াল্লাহ আনহা বললেন, 'কখনোই না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন»।(বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ)

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন,

«قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ»،

অর্থ «বিদ্বানগণ বলেন, খাদীজা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহা) -এর কথার অর্থ হচ্ছে, আপনার উপরে কোন কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় কিছু আপতিত হবে না। কেননা আল্লাহ আপনার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী দান করেছেন। যেগুলি তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ

করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাব ধ্বংস-যজ্ঞ বা বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে»।(নববী, শারহু মুসলিম, ২/২০২)।

ইমাম কিরমানী (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন,

«وفيه أن خصال الخير سببٌ للسلامة من مَصارِع السوء، والمكارم سببٌ لدفع المكاره»

‘আর এতে (খাদীজা রদ্বিয়াল্লাহ আনহা-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায়। সচ্চরিত্র কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধের উপায়’।(শারহুল কিরমানী আলা সহীহিল বুখারী, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), পৃঃ ২০৬)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন,

«فِيهِ أَنَّ مَكَارِم الْأَخْلَاق وخصال الْخَيْر سَبَب للسلامة من مصَارِع الشَّرّ والمكاره فَمن كثر خَيره حسنت عاقبته ورجى لَهُ سَلامَة الدِّيْن وَالدُّنْيَا»

‘এতে (খাদীজা রদ্বিয়াল্লাহ আনহা-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম। অতএব যার সৎকর্ম বেশী তার পরিণতি সুন্দর হবে। আর তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার আশা করা যায়’।(বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী), ১/৬৩ পৃঃ)।

তওবা ও ইস্তিগফার করা : পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হল ঐ পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য সাওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে।সেই সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর নিকটে তওবা করতে হবে। কেননা ক্বুর'আন ও হাদীস প্রমাণ করে যে, মানুষের গোনাহের কারণেই বিপদ-মুসীবত আপতিত হয় এবং তওবা ব্যতীত তা দূরীভূত হয় না।

সুতরাং মানুষকে বেশী বেশী তওবা করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যে বিপদে-আপদে পতিত হই, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য বা সেগুলো হালকা হওয়ার জন্য মুসীবত দূরীভূত হওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

«يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً»

«'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর’»(তাহরীম ৬৬/৮)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

«وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ»

«তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো»

(হূদ ১১/৯০)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,
«وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»
«হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' (নূর ২৪/৩১)।»

তিনি আরো বলেন,
«وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ»
«অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে» (আনফাল ৮/৩৩)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,
«مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ»
«যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হতে যা সে কখনো কল্পনা করে না'।»(আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯)।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি বলল,
«أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ»
(আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকটে তওবাকারী) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হতে পলায়ণ করে থাকে'।(তিরমিযী, হাদীস সহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩)।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা : তাক্বওয়া হচ্ছে সকল আমল সংশোধনের উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
«يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا»
অর্থ «হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে» (আহযাব ৩৩/৭০-৭১)।

মহান আল্লাহ বলেন,

«وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ»

অর্থ«যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযক দান করবেন»

(তালাক ৬৫/২-৩)।

ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন।(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩)।

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী বালা-মুসীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

«وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ»

«আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। আমরা উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত» (সুরা-মীম আস-সাজদা ৪১/১৭-১৮)।

অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নবী সালিহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে।(তাফসীর ইবনে কাসীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا»

«আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্ত ক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব'» (মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)।

খাদ্য-পানীয়ের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা :

খাদ্য ও পানপাত্র সমূহ ঢেকে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় এতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ»

«খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছীবত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে»।(মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮; সিলসিলা সহীহাহ হা/৩৭; ইরওয়া হা/৩৯; সহীহুল জামি‘ হা/৭৬০৮)।

বিভিন্ন দু‘আ করা :

বালা-মুসীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐসব নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে পঠিতব্য নানা রকম দু‘আ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। সেগুলি নিয়মিত পাঠ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ.»

«যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো‘আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দু‘আকে আবশ্যিক করে নাও’»।(তিরমিযী হা/৩৫৪৮; সহীহুল জামে‘ হা/৩৪০৯; সহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৪; মিশকাত হা/২২৩৯)।

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু‘আ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِىَ.»

«যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, অর্থ : ‘আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী’ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না’»।(আবূদাঊদ হা/৫০৮৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১)।

দু‘আ ইউনুস বেশী বেশী পাঠ করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ« «،إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

«আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি'»(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

.دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ« «فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ

«যুন-নূন ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাছের পেটে থাকাকালে যে দু'আ করেছিলেন তা হল- 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই যালিমদের দলভুক্ত'»(আম্বিয়া ২১/৮৭)। যে কোন মুসলিম কোন বিষয়ে কখনো এর মাধ্যমে দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন'।(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; সহীহুল জামে' হা/৩৩৮৩)।

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দু‘আ :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ»

«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধ্যায় এসব দু‘আ করা পরিত্যাগ করতেন না- ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ব্যাপারগুলো গোপন রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হতে, পশ্চাতের বিপদ হতে, ডানের বিপদ হতে, বামের বিপদ হতে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হতে’»।(আহমাদ হা/৪৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২০০, সনদ সহীহ)।

আবূ হুরায়রাহ রদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»

«নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালা-মুসীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন»। (বুখারী হা/৬৩৪৭, ৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭)।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দু‘আ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ»

«যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ তখন তাকে বলা হয়, তুমি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শায়ত্বনরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শায়ত্বন বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে’»।(আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; সহীহুল জামে‘ হা/৪৯৯; সহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য ও সবর

আল্লাহর দ্বীনের কালিমাকে বুলন্দ ও এ দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার নিমিত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ভূমিকা ও অংশ রয়েছে।আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা তিনি সঠিকভাবে ব্যয় করেছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

«ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادمًا ولا امرأة»

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দান ব্যতীত তাঁর হাত দিয়ে কাউকে মারেননি এমনকি তার স্ত্রী ও খাদেমকেও না।(মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮)

তিনি তাদেরকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা থাকার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও লোকেরা দূরে সরে যাওয়ার পরও তিনি স্থির থেকেছেন এসকল আদর্শই প্রমাণ করে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধৈর্য ও সবর ছিল কত শীর্ষে!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছর ধরে হেরা গুহায় ইবদাত করতেন সে সময় তাকে কেউ কষ্ট দেয়নি, আর কুরাইশরাও তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরোধিতা করেনি, অথবা কাফের গোষ্ঠীর কেউ তার বিরুদ্ধে একটি তীরও নিক্ষেপ করেনি, কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে তাওহীদের দিকে প্রাকাশ্যে আহ্বান, এবং ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তেই হতে হবে এ আহ্বান জানালেন, তখনই কাফেররা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল:

অর্থাৎ সে কি বহু মাবূদকে এক মাবূদে পরিণত করছে।(সূরা সাদ, আয়াত: ৫)

তারা মূর্তিকে তাদের ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম মনে করত, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন:অর্থাৎ আমরা তো তাদের ইবদাত এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিয়ে দিবে।(যুমার, আয়াত: ৩)

তারা কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করত, যা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন:
অর্থাৎ, বলুন: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করে? বলুন: আল্লাহ! হয় আমরা, না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।(সূরা সাবা, আয়াত: ২৪)

উহুদের যুদ্ধ ইসলামের এক মহা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর সবর ও ধৈর্যের যে নিদর্শন প্রকাশ পায় তা কিয়ামাত পর্যন্ত তা অবিস্মরণীয় । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের মহা যুদ্ধে তিনি ভীষণ আক্রান্ত ও যখম হন, এমনকি তার চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়। সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

সাহাল বিন সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহত হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন:

«أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن كان يسكب الماء وبما دووي، قال :كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعًا من حصير وأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه»

আমি আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি, আমি জানি: কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাত প্রাপ্ত জায়গা ধৌত করেছে এবং তাতে কে পানি ঢালছিল এবং কোন জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ধৌত করেছিল এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লোটা থেকে পানি ঢালছিলেন। আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন দেখলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত প্রবাহিত হওয়া আরো বৃদ্ধি হচ্ছে তখন তিনি চাটাই পুড়িয়ে লাগিয়ে দিলেন, তখন রক্ত প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গেছিল এবং তার মুখ মন্ডলে আঘাত লেগেছিল এবং লৌহ বর্ম ভেঙ্গে তাঁর মাথায় প্রবেশ করেছিল।(মুসলিম, হাদিস: ১৭৯০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুনাইন যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হুনায়নের যুদ্ধের দিন মুসলিম বাহিনী যখন হটে যাচ্ছিল, তখন তিনি তার সওয়ারীকে লাথি মেরে কাফেরদের দিকে দৌড়ানো শুরু করেন; কিন্তু আমি এই নিয়তে সওয়ারীর লাগাম ধরে বাধা দেই যেন সে দ্রুত না যেতে পারে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় বলছিলেন:

«أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب»

আমি সত্য নবী, মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরী।(মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৬; বুখারি, হাদিস: ২৮৭৪)

বীর সেনানী অশ্বারোহী, বহু বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রবাহের নায়কআলী বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন: যখন একদল অন্য শত্রু দলের মুখামুখি হত ও যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করত, তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় গ্রহণ করতাম, তিনিই সর্বাগ্রে শত্রুর নিকটবর্তী হতেন।(বাগাবী শরহে সুন্নাতে বর্ণনা করেছেন, এবং দেখুন: সহীহ মুসলিম ৩/১৪০১)

দাওয়াতী কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের কারণেই উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন হয় ও উত্তম আদর্শ রচিত হয় এমনকি যার ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মুসলিম বাহিনী সারা আরব উপদ্বীপ, শাম ও মা ওরাআন নাহার [সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগান সীমান্ত] পর্যন্তই ইসলামের ঘোড়া অবাধে বিচরণ করেছে, এমনকি পাকাও কাঁচা সকল ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليل وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال»

আল্লাহর রাস্তায় আমাকে ভীত সন্ত্রস্থ করা হয়েছে কিন্তু এর প্রতিশোধ হিসেবে কাউকে ভীত সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আল্লাহর রাস্তায় আমাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু এর প্রতিশোধ হিসেবে কাউকে কষ্ট দেয়া হয়নি। আমার উপর ত্রিশ দিন ও রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু আমার ও বেলালের জন্য এমন কোন খাদ্যও ছিল না যা কোন ব্যক্তি খেতে পারে, তবে শুধু বেলাল যা কিছু তার বগলের নিচে নিয়েছে।(তিরমিযী, হাদিস: ২৪৭২; আহমাদ, হাদিস: ১৪০৫৫)

অথচ তাঁর নিকট অনেক সম্পদ এসেছে, অনেক গণিমতের মাল লাভ করেছেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে অনেক বিজয় দান করেছেন। এরপরও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কোন অর্থ-কড়ি রেখে যাননি। তবে তিনি যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তা হল: এলেম বা জ্ঞান। বস্তুত এটাই হল মীরাসুন্ নবুওয়াহ বা নবুওয়্যাতের উত্তরাধিকার। কেউ যদি সে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চায়, সে যেন তা গ্রহণ করে এবং আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، ولا أوصى»
«بشيء

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার দিনার-দিরহাম, কোন প্রকার ছাগল বা উট রেখে যাননি এবং কোন প্রকার অসীয়তও করে যাননি।(মুসলিম, হাদিস: ১৬৩৫)

মুখতাসার যাদুল মা'আদ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরন ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহি'মাহুল্লাহ

দ্বীনের পথে সাহাবীদের জুলুম-নির্যাতন সহ্যের কিছু দৃষ্টান্ত

সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থা এই ছিল যে, যার গোত্রীয় শক্তি ছিল, সে তার গোত্রের সাহায্য পেত এবং স্বীয় গোত্রের লোকেরা তাকে অন্যান্য কাফিরদের কষ্ট হতে রক্ষা করত। কিন্তু বহু সংখ্যক সাহাবীর এ রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারা দ্বীনের পথে কুরাইশদের পক্ষ হতে কঠিক যন্ত্রনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা ভোগ করেছেন নানা ধরণের শাস্তি ও জুলুম-নির্যাতন। তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর মাতা সুমাইয়া এবং তাঁর পরিবার। তারা আল্লাহর পথে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন।

যখন মরুর বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন তাদেরকে চিৎ করে শায়িত করে শাস্তি দিত। সে অবস্থায় একদা রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেছিলেন- "হে ইয়াসের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।" অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইয়াসের ইন্তেকাল করেন।

দুর্বৃত্ত আবু জাহল সুমাইয়া (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে) এর লজ্জাস্থানে তীর দিয়ে আঘাত হানলে তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। তারা আম্মারের উপরও শাস্তি কঠোর করে, কখনও তাকে তারা উত্তপ্ত রোদ্রে ফেলে শাস্তি দিত, কখনও ভারি প্রস্তর তার উপরে চাপিয়ে রাখতো, আবার কখনও আগুনে দগ্ধকরে শাস্তি দিত এবং বলতোঃ যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে গালি না দিবে অথবা "লাত" ও "উয্যা" সম্পর্কে ভালো কথা না বলবে ততক্ষণ আমরা তোমাকে ছাড়বোনা। তিনি বাধ্য হয়েই তাদের কথায় সম্মতি দেন এবং পরবর্তীতে ক্রন্দনরত অবস্থায় ও রসূল (ﷺ) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর যদি আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়- তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহর গযব”। (সূরা নাহল-২৭:১০৬)

যেসমস্ত সাহাবী কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বিলাল (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাদের অন্যতম। তাকে আল্লাহর রাস্তায় কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির কাছে নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ওরা তাঁকে মক্কার গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ। ওরাকা বিন নাওফাল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন- হ্যাঁ, বিলাল। ঠিক বলছ। আহাদ, আহাদ। আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাঁকে হত্যা করে ফেল আমি তাঁর হত্যায় মমতা প্রকাশ করব।

বিলাল (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উমাইয়া বিন খালফের দাস ছিলেন। উমাইয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত রৌদ্রে অভূক্ত অবস্থায় ফেলে রাখত। যখন দ্বি-প্রহরের কঠিন রোদে বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠতো তখন তাকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে যেত, অতঃপর চিৎ করে শুইয়ে তার বক্ষদেশে বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। একদা আবু বকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তাকে একটি কৃষ্ণ দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মতান্তরে তিনি তাকে পাঁচ উকিয়া (দু’শ দিরহাম) রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

খ. বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :

বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত নাযিল হলে কিছু করণীয় রয়েছে, যা করলে মানুষ ঐসব থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে সে করণীয়গুলো উল্লেখ করা হল।-

বেশী বেশী ইবাদত করা : বিপদ আসলে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। যাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا.»

«সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দো‘আ

করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে’»।(বুখারী হা/১০৪৪; নাসাঈ হা/১৫০০; মিশকাত হা/১৪৮৩)।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহি'মাহুল্লাহ বলেন,

«قَالَ الطِّيبِيُّ أُمِرُوْا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلاَءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ،»

«ত্বীবী বলেন, বালা-মুসীবত প্রতিরোধের জন্য যিকর, দু‘আ, সলাত ও সাদাক্বার মাধ্যমে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’।» (ফাৎহুল বারী, ২/৫৩১ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী, ৭/৭১ পৃঃ; মির‘আত ৫/১৪৮ পৃঃ)

হাফিয ইবনুল ক্বাইয়্যিম رحمه الله বলেন,

«والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء»

‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চন্দ্রগ্রহণের সময় সালাত, দাসমুক্তি, বেশী বেশী যিকর ও দান-সাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এসব কাজ বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ লাভের মাধ্যম’।

(ইবনুল ক্বাইয়্যিম, আল-ওয়াবিলুস সায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃঃ), ১/১৪২ পৃঃ)।

নফল সালাত আদায় করা : বালা-মুসীবত আসলে নফল সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে তা থেকে রক্ষার জন্য দু‘আ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ،»

‘সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হল দু’টি নিদর্শন, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত অবস্থায় সালাতের দিকে আসবে’।(বুখারী হা/১০৫২; সহীহুল জামে‘ হা/১৬৪৪।

আবূ হুরায়রাহ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনজন শিশু ব্যতীত কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে জুরাইজ নামে ডাকা হত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট এক

মহিলা আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর মহিলা একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল এটি কার থেকে? মহিলা বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি-গালাজ করল। তখন জুরাইজ অযু করে সালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, ঐ রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না, তবে মাটি দিয়ে'।(বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০)।

আবূ হুরায়রাহ রদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হ'ল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল।

সারা অযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, মহিলাটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শায়ত্বনকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজিরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর।

সারাহ ইবরাহীম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদীকে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে?(বুখারী হা/২২১৭, ২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০)।

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা : আবূ উমামা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.»

«তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক»।(তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ»،

«আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব’»।(বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।)

সুতরাং এসময়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দিবেন।

যিকির করা : যিকির করা আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম। তাই বালা-মুসিবত আসলে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করার মাধ্যমে তাঁর রহমত লাভের চেষ্টা করা উচিত। যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ»،

«নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহে
মধ্যে দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু’টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহর (যিকর) স্মরণ করবে’»।(বুখারী হা/১০৫৮)।

সাদাক্বাহ করা : জান-মালের উপরে বিপদাপদ ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-সাদাক্বাহ করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন,

«إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ»
«নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী'» (আ'রাফ ৭/৫৬)। তিনি আরো বলেন,
«مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ»،
বস্তূত সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (তওবা ৯/৯১)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ»
'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।(সিলসিলা সহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪)।

তিনি আরো বলেন,
«صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»
«গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়»।(সিলসিলা সহীহাহ হা/১৮৪০)।

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম রহি'মাহুল্লাহ বলেন,
«فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.»
«দান-সাদাক্বার অত্যাশ্চর্য প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসিবত প্রতিরোধে। যদিও সে (দানকারী) পাপী, অত্যাচারী, এমনকি ছোট-খাট কুফরীকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা দানের দ্বারা দানকারী থেকে নানা ধরনের বালা-মুসিবত প্রতিহত করেন, যা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল মানুষের জানা বিষয়। দুনিয়াবাসী এর দ্বারা স্থায়ীত্ব লাভ করে। কেননা তারা তা দ্বারা পরীক্ষিত'»।(আল-ওয়াবিলুছ সায়ব মিনাল কামিতি তাইয়িব, ১/৩১ পৃঃ)।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহি'মাহুল্লাহ বলেন,
أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابَ وَأَنَّهَا قَدْ تُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ،
'নিশ্চয়ই সদাক্বা আযাব প্রতিরোধ করে এবং তা গোনাহ মিটিয়ে দেয়'।(ফাৎহুল বারী, ১/৪০৬)।

বেশী বেশী নেক আমল বা সৎকাজ করা

আমলে সালেহের মাধ্যমে আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«صَنَائِعُ المَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ المَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الآخِرَةِ»

«সৎকর্ম করা বালা-মুসিবত, বিপদাপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষার মাধ্যম। আর দুনিয়াতে যিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত, আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে»

(ত্বাবারানী, আল-আওসাত; সহীহুল জামে‘ হা/৩৭৯৫; সহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০)।

হাফিয ইবনুল ক্বায়্যিম (رحمه الله) বলেন,

«وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالِابْتِهَالُ إِلَى اللهِ وَالتَّوْبَةُ وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيرٌ فِيْ دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُوْلِ الشِّفَاءِ»

«আর রোগ থেকে আরোগ্যের বড় প্রতিষেধক হল সৎকাজ করা, দান-সাদাক্বা করা, যিকর-আযকার ও দো‘আ করা, কাকুতি-মিনতি করা এবং বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করা। রোগ প্রতিরোধে এবং আরোগ্য লাভে এসব কাজের প্রভাব রয়েছে»(ইবনুল ক্বাইয়্যিম,যাদুল মা‘আদ, ৪/১২৪)।

আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দু‘আ করা

আযাব-গযব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো‘আ করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর নিকটে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহ’লে আল্লাহ দু‘আ কবুল করবেন এবং পাপীদেরকে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন,

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ»

«আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব -অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শায়ত্বন তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখালো» (আন‘আম ৬/৪২-৪৩)।

তিনি আরো বলেন,

«وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ»

«কোন জনপদে যখন আমরা কোন নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে (পরীক্ষা করার জন্য) নানাবিধ কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি। যাতে তারা অনুগত হয়» (আ'রাফ ৭/৯৪)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.»
«সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু)-এর মৃত্যু হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে পরস্পর বলাবলি করছিল»।(বুখারী হা/১০৬৩, ১০৪০; মিশকাত হা/১৪৮৩)।

বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত দু'আ গুলো পড়া যায়।

দু'আ ইউনুস পড়া : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا دَعَا بِهِ فَفُرِّجَ عَنْهُ دُعَاءُ ذِيْ النُّوْنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ»
«আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দিব যে, তোমাদের কারো উপরে যখন দুনিয়াবী কোন কষ্ট-ক্লেশ অথবা বালা-মুসিবত নাযিল হয়, তখন তার মাধ্যমে দো'আ করলে তা দূরীভূত হয়। তাহলে মাছ ওয়ালা ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দু'আ- 'লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাক ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন»।(সহীহুল জামি' হা/২৬০৫;সহীহাহ হা/১৭৪৪)।

রোগ বালায় থেকে পরিত্রাণের দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ»
«আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম'। (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হতে)।»(আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০)

সমস্ত সৃষ্টির ক্ষতি থেকে হিফাজাতের দু'আ

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

«আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব’ (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হতে পানাহ চাচ্ছি)।» (মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।)

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

«وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا»

«আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়»(সূরাহ ইসরা ১৭/১০৯)।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ»

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না’।(তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; সহীহুল জামে‘ হা/৭৭৭৮)।

তিনি আরো বলেন,

«عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللهِ »

অর্থাৎ «দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়»।(তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯; সহীহুল জামি‘ হা/৪১১৩)।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ»

অর্থাৎ «যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত»।(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭)।

আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা :

যে এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানে গমন করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

«فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

অর্থাৎ «তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান হতে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না»।(বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮)।

উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ পালনের মাধ্যমে আমরা বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করা জরুরি। আর বালা-মুসিবত আপতিত হয়ে গেলে সৎকর্ম, তওবা-ইস্তিগফার ও দু'আর মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

বালা মুসিবতের মোকাবেলার তিনটি উপায় আছে ধৈর্য, দুআ ও শুভ পরিণতির অপেক্ষা

আল্লাহ ইমানদার কে রক্ষা করছেন এবং ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। মু'মিনগণ প্রতি সালাতে তাদের দু'আয়ে তাকে অংশীদার করছে (অর্থাৎ একজন অন্যজনের প্রতি দোয়া করছে)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন। কুরআন মজীদ সর্বোত্তম উপদেশে পরিপূর্ণ, সর্বোপরি পরম করুণাময়ের দয়াতো আছেই।

আখিরাতে নেক আমলকে দশগুণ এমননি সাতশতগুণ বা তারও বেশি বর্ধিত করা হবে। অপরপক্ষে যখন নাকি বদ আমলকে বর্ধিত করা বা গুণ করা হবে না এবং আমাদের রব্বে কারীম তা ক্ষমা করেও দিতে পারেন। কতবারইনা আমরা আল্লাহর মহানুভবতা লক্ষ্য করেছি। এ মহানুভবতা, উদারতা ও দয়া অপ্রতিদ্বন্দী ও অতুলনীয়। অন্য কারোও বদান্যতা তার বদান্যতার এমনকি নিকটেও পৌছতে পারে না।

যদি কেউ আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করে ,সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে বা দ্বীনে হক্কের উপর ঈমান রাখে, যদি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসে তবে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। যদি কেউ নিজ মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করে এবং সওয়াবের কাজ করার পর যদি তার নিকট খুশি লাগে তাহলে তার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তার সাথে অনেক কল্যাণ আছে যা অনেক সময় সে বুঝতে পারে না।

নিচের হাদীসে যেমনটি আছে তেমনভাবে যদি একজন মুসলিম জীবনের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারে তাহলে তার কোন ভয় নেই।

"মুমিনের অবস্থা কতইনা চমৎকার! তার সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। ঈমানদার ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি নয়। যদি সুখী হওয়ার মতো কিছু ঘটে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়। আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তিনি সমস্যা বা অভাব-অনটনে পড়েন তবে তিনি ধৈর্য ধরেন এবং এটা তার জন্য উপকারী।"

দু:খ যাতনার সময় ধৈর্য ধারণ হলো সফলতা ও সুখের উপায়। কিতাবুল্লাহ থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো যাতে ধৈর্য্যের তাকীদ করা হয়েছে:

"এবং ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়।" (সূরা আন নাহল:১২৭)

"অতএব, ধৈর্য ধরাই ভাল। আর তারা যা বলছে এর বিরুদ্ধে আল্লাহই সহায়ক।" (সূরা ইউসুফ: ১৮)

"সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর উত্তম ধৈর্য।" (সূরা আল মাআরিজ:৫)

"তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ।" (সূরা রাআদ:২৪)

"তোমার উপর যে বালা মুসিবত এসেছে বা আসবে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং করিও।" (সূরা লোকমান:২৭)

"তোমরা ধৈর্য ধর এবং (তোমাদের শত্রুদের সাথে) ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর (অর্থাৎ তাদের চেয়েও বেশি ধৈর্য ধর) এবং যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাক বা যেখান থেকে শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে পারে সেখানে সৈন্য-বাহিনী স্থাপন করে তোমাদের অঞ্চলকে রক্ষা কর।" (সূরা আলে ইমরান:২০০)

ওমর রদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন : "ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা সুন্দর জীবন লাভ করেছি।"

আহলে সুন্নতের বা সুন্নতের অনুসারী লোকদের বালা-মুসিবতের মুকাবিলার তিনটি উপায় আছে: ধৈর্য, দোয়া ও শুভ পরিণতির জন্য অপেক্ষা।

একটি সহীহ হাদীসে আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

“মন্দ কথা শুনার পরে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল অন্য কেহ নেই। তারা দাবি করে যে, আল্লাহর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখছেন ও রিযিক দিচ্ছেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

“আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। (আমি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি) তিনি এর চেয়েও বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

“যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাকে অনবরত ধৈর্য ধরার জন্য অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করবেন।”

উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বপ্ন ও কল্পনার মাধ্যমে অর্জিত হয় না, একমাত্র ত্যাগ ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। মানুষেরা আপনার সাথে কতটা খারাপ আচরণ করল তাতে দুঃখ করবেন না। বরং তারা আল্লাহর সাথে কতটা খারাপ আচরণ করে (আর আল্লাহ কতটা ধৈর্য ধরছেন) তা পর্যবেক্ষণ করে (ধৈর্য ধারণ করে) শিক্ষা গ্রহণ করুন।

ইমাম আহমদ রহি'মাহুল্লাহ তার ‘কিতাবুয যুহদ’ বা ‘যুহদ’ নামক পুস্তকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন-

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ বলেন-

“হে আদম সন্তান! তুমি বড়ই অদ্ভুত। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত কর এবং আমি তোমাকে রিযিক দিলাম অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রশংসা কর। তোমাকে আমি নেয়ামত দিয়ে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার প্রকাশ ঘটাই অথচ তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি পাপ করে আমার অবাধ্যচারিতা করছ অথচ তুমি আমার নিকট ফকীর, অভাবী ও মুখাপেক্ষী! আমার কল্যাণ তোমার নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে অথচ তোমার পাপ ও মন্দকার্য আমার দিকে উঠে আসছে।”

ঈসা আলাইহিস সালামের এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় ত্রিশটি রোগী ও অনেক অন্ধ লোককে আরোগ্য করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা তার (বিরুদ্ধে) শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

মুসীবতগ্রস্থের চিকিৎসায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো"। (সূরা বাকারা-২: ১৫৫-১৫৬)

সহীহ বুখারীতে উম্মে সালামা হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে এই দু'আ পাঠ করবে

إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعُونَ اللَّهم أجرنِي في مُصيبَتى وأخلفْ لي خيراً منهَا

"আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই মুসীবতে ছাওয়াব ও বিনিময় দান কর এবং এর বদলে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান কর"।(মুসলিম, হাএ.হা/২০১১, ইফা.হা/১৯৯৫, ইসে.হা/২০০২, মিশকাত, হাএ. হা/৪৫২৮)

তাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই মুসীবতে সাহায্য করবেন ও সাওয়াব দিবেন এবং তাকে উত্তম বদলা দান করবেন।

এই বাক্যটি মুসীবতের সর্বোত্তম চিকিৎসা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাধিক উপকারী। কেননা এতে এমন দু'টি মৌলিক বিষয় একত্রিত হয়েছে, যা ভালভাবে অবগত হলে মুসীবত ও বিপদাপদের সময় বান্দার অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি হাসিল হবে।

প্রথম মূলনীতিঃ বান্দা এবং তার জানমাল, পরিবার-পরিজন ও ধন-দৌলত মূলতঃ সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। বান্দার নিকট আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এগুলো আমানত রেখেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যখন তার থেকে এগুলো নিয়ে নিবেন, তখন এটি ঐ রকমই হবে, যেমন আমানত দাতা আমানত গ্রহিতার নিকট থেকে নিজ আমানত ফেরত নেয়।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ বান্দার গন্তব্যস্থল হচ্ছে আল্লাহর দিকে। সে দুনিয়ার মায়া পিছনে ছেড়ে তার প্রভুর নিকট একাই চলে যাবে। যেমন তাকে প্রথমে পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ছাড়া দুনিয়ায় একাকী পাঠিয়েছিলেন। এই যেহেতু বান্দার শুরু ও শেষের অবস্থা, তাই কোন কিছু পেয়ে সে আনন্দিত হয় কিভাবে? আর কোন কিছু হারিয়ে ব্যথিত হয় কিভাবে? সুতরাং তার শুরু ও শেষ নিয়ে চিন্তা করাই এই রোগের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা।

মুসীবতে পতিত হয়ে পেরেশানী হতে বাঁচার অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে, বান্দা এই দৃঢ় বিশ্বাস করবে, যেই মসীবতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তা কখনই তাকে ছাড়ার ছিলনা। আর যেই মুসীবতে সে পড়েনি, তা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধই ছিলনা। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِى كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না”।(সূরা হাদীদ-৫৭:২২-২৩)

মুসীবতে পড়ে কেউ যদি স্বীয় মুসীবতটি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার রব (প্রভু) তার জন্য ছুটে যাওয়া বস্তুর অনুরূপ বা তার চেয়ে আরও উত্তম বস্তু রেখে দিয়েছেন। মুসীবতে পড়ে সে যদি সবর করে ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা এমন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন, যা ঐ মুসীবতের চেয়ে অনেক বড়।

মুসীবতে পতিত ব্যক্তির উচিৎ তার ডানে-বামে তাকিয়ে অন্যান্য মুসীবতগ্রস্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সে অচিরেই দেখতে পাবে যে, কোন উপত্যকাই মুসীবতগ্রস্ত থেকে খালী নেই এবং প্রত্যেক গ্রাম ও শহর শুধু সুখী মানুষে ভরপুর নয়। সুতরাং ডানে ও বামে তাকালে সে দেখতে পাবে, কেউ প্রিয় বস্তুকে হারিয়েছে আবার কারও উপর বিরাট মুসীবত চেপে বসেছে।

দুনিয়ার আনন্দ ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মতই অথবা পথিকের ছায়া গ্রহণের মতই। দুনিয়ার সুখ অল্প সময় হাসালেও অধিক সময় কাঁদায়, এক দিন খুশী করলে যুগ যুগ ধরে কষ্ট দেয় এবং অল্প সময় ভোগ করালেও অধিক সময় বঞ্চিত করে।

মুসীবতের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা জরুরী যে, হা-হুতাশ করে হারিয়ে যাওয়া বস্তূকে ফেরত আনা যাবে না এবং দুঃখও লাঘব হবে না; বরং পেরেশানী ও হাতাশা আরও বৃদ্ধি পাবে।

মুসীবতে পড়লে বান্দা বিশ্বাস করবে যে, ধৈর্যধারণকারী এবং ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীগণকে যে নিয়ামাত ও ছাওয়াব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তা মুসীবতের চেয়ে বহুগুণ বড়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এ সব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত"।(সূরা বাকারা-২:১৫৬-১৫৭)

জেনে রাখা উচিৎ যে, হতাশা প্রকাশ করলে এবং ধৈর্যহারা হলে মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল শত্রুকেই খুশী করে, বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তাঁর প্রভুকে ক্রোধান্বিত করে, শয়তানকে খুশী করে, প্রতিদান নষ্ট করে এবং স্বীয় নফসকে দুর্বল করে। আর বান্দা সাওয়াবের আশায় সবর করার মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করে, বন্ধুকে আনন্দিত করে এবং শত্রুকে কষ্ট দেয়।

বানদার আরও জেনে রাখা উচিৎ যে, সবরের মাধ্যমে যে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয়, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিষটি ফেরত পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

মুসীবতের বদলে তার জন্য বাইতুল হামদই যথেষ্ট, যা মুসীবতে ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীর জন্য এবং মুসীবতের সময় তার প্রভুর প্রশংসা করার কারণে তার জন্য বানিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং হে বন্ধু! তুমি লক্ষ্য কর। কোন মুসীবতটি বেশী কষ্টকর? দুনিয়ার মুসীবত? না জান্নাতুল খুলদের বাইতুল হামদ ছুটে যাওয়ার মুসীবত?

মুসীবতের সময় বান্দা তার মনকে এই ভেবে শান্তনা দিবে যে, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে উত্তম বদলা দিবেন। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিষ হারালে বদলা পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহকে হারিয়ে ফেললে এর কোন বদলা পাওয়া যায়না।
বান্দার বুঝা উচিৎ যে, তার নসীবে যে পরিমাণ মুসীবত লেখা ছিল, তা আসবেই। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন, যে অসন্তুষ্ট হবে, তার উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন।

জেনে রাখা উচিৎ ধৈর্য হারা হওয়ার শেষ পরিণতি হল অনিচ্ছাকৃত সবর। অর্থাৎ মুসীবতে পড়ে কিংবা প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তূ হারিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হাহুতাশ করলেও এক সময় তাকে সবর করতেই হবে এবং উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি ও বিলাপ করলে, অধৈর্য হয়ে মাথার চুল ছিড়লে, বুক ও গালে আঘাত করলে এক সময় তার শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং ক্লান্ত হয়ে সে মুসীবতে বিরক্তিবোধ করা থেকে বিরত হবে। ফলে সে সবর করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার এই সবর প্রশংসিত নয় এবং তার বিনিময়ে সে ছাওয়াবও পাবেনা।

وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

"আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ ওয়া তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে মুসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় সন্তুষ্ট থাকবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি"।(সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব লিল আলবানী, মাশা.৩/৩৪০৭ , সহীহ তিরমিযী,হা/২৩৯৬,ইবনে মাজাহ তাও. হা/৪০৩১)

বান্দার আরও জেনে রাখা উচিৎ যে, মুসীবতে পতিত ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী ঔষধ হচ্ছে, সে তার প্রভুর পছনদনীয় বিষয়কে মাথা পেতে মেনে নিবে। ভালবাসার অন্যতম বৈশিষ্ট ও রহস্য হচ্ছে মাহবুবের অনুসরণ করা।

সুতরাং যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু সে তার মাহবুবের পছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দ করে এবং মাহবুবের অপছন্দনীয় বস্তুকে পছন্দ করে, সে নিজের নাফ্সের সাথে মিথ্যাবাদী এবং অচিরেই সে তার মাহবুবের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবে। আবু দারদা রদিয়াল্লাহ আনহু বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন তিনি চান যে, তার প্রতি বান্দা সন্তুষ্ট থাকুক।

মুমিন বান্দার উচিৎ, দু'টি নিয়ামতের মাঝে তুলনা করা। তার দেখা উচিৎ কোন্ নিয়ামাতটি অধিক বড়? যেই নিয়ামাতটি ছুটে গিয়েছে সেটি? না মুসীবতে ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব ও প্রতিদানের যেই নিয়ামাত রয়েছে সেটি?
মুসীবতে সবরের মাধ্যমে অর্জিত নিয়ামাতটিই যদি তার কাছে অধিক বড় বলে মনে হয়, তাহলে তাকে ঐটিকেই প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিৎ। কারণ আল্লাহর তাওফীকেই সে সঠিক সিদ্ধান্তমতে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে।

এটিও চিন্তা করা উচিৎ যে, মুসীবতে ফেলে পরীক্ষাকারী (আল্লাহ্ তা'আলা) সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সর্বাধিক রহমতকারী। সেই যাতে পাক তাকে ধ্বংস করার জন্য কিংবা শাস্তি দেয়ার জন্য মুসীবতে ফেলেন নি; বরং তার সবর, আল্লাহর প্রতি তার সন্তুষ্টি এবং তাঁর ঈমান পরীক্ষা করার জন্যই তাকে মুসীবতে ফেলেছেন। যাতে করে বান্দা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে এবং তার কাছেই আত্মসমর্পন করে।

আরও জানা উচিৎ যে, মুসীবতে পতিত হওয়া অহংকারী এবং পাষাণ হয়ে যাওয়াসহ বহুবিধ ধ্বংসাত্মক এবং বড় বড় অসুখ-বিসুখ হতে বাঁচার সর্বোত্তম একটি মাধ্যম।

আরও জানা উচিৎ যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাই আখিরাতের সুখ অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। অনুরূপ দুনিয়ায় বিলাস বহুল জীবনই আখিরাতে দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সত্যবাদী ও সত্যায়িত নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করা জরুরী। তিনি বলেন-

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

"শাহওয়াত তথা চিত্তাকর্ষক পাপকাজ দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে কষ্টসাধ্য আমল দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।(বুখারী, অধ্যায়ঃ জান্নাতের গুণাগুণের বর্ণনা, তাও. হা/৬৪৮৭, মিশকাত, হাএ. হা/৫১৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য সহজলভ্য ও চাকচিক্যময় হারাম কাজে লিপ্ত হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট ও শ্রম ব্যয় করে শরীয়তের কঠিন বিধানগুলো পালন করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে স্থান দিবেন।

মূলতঃ এর মাধ্যমেই বান্দার জ্ঞান-বুদ্ধির পার্থক্য করা যায় এবং মহা পুরুষদের আসল অবস্থা জানা যায়। প্রকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে স্থায়ী সুখ-শান্তিকে ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির উপর প্রাধান্য দেয় এবং সেটিকেই নিজের জন্য নির্বাচন করে।

ঐ সমস্ত নিয়ামাত, স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং মহান সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। আরও দৃষ্টি রাখা জরুরি ঐ সমস্ত অপমান, চিরস্থায়ী হতাশা এবং শাস্তির প্রতি, যা তৈরী করে রাখা হয়েছে অপরাধী এবং আমলহীন লোকদের জন্য। অতঃপর প্রত্যেক কে ভাবা জরুরি যে, তার নিজের জন্য উভয়টির কোনটা অধিক উপযোগী হবে?

বালা মুসিবত দূরিকরণে ইসলাহের গুরুত্ব

নিজের ইসলাহের ফিকির করা, ইসলাহের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা এবং কার্যতভাবে ইসলাহে লেগে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। ইসলাহ মানে হল, জীবনটা ঈমানী জীবন হওয়া। জীবনের প্রত্যেক শাখা ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ-আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া। বিষয়টি বলতে তো অনেক সহজ কিন্তু আমলী ময়দানে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের অনেক অবহেলা ও প্রান্তিকতা প্রকাশ পায়। যার বড় একটি কারণ হল, ইসলাহ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইলমের অভাব।

নেকীর কাজ ছোট হলেও তা ছাড়া যাবে না আর গুনাহের কাজ ছোট হলেও তা করব না। কিন্তু কবীরা গুনাহের বিষয়টি আরো অনেক বেশি ভয়াবহ। এ ধরনের গুনাহের নামই তো হল موبقات অর্থাৎ ধ্বংসকারী গুনাহসমূহ, বরবাদকারী গুনাহসমূহ। যার জন্য দুনিয়ায় বালা মুসিবতে ভরে গিয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে হিফাযত করুন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী আমলগুলো করার তাওফীক দান করুন।

ইসলাহের পথে যে কাজগুলো করা জরুরি

ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম।আল্লাহর নৈকট্য, সওয়াব ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ হল, ফরয ইবাদতগুলো যথাযথভাবে আদায় করা।ফরযের পর অতিরিক্ত নফল ইবাদত।ফরযের পরে নিয়মিত সুন্নাত ও নফল ইবাদত পালন বান্দাহকে আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

ফরয ইলম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, পেশাগত দায়িত্ব, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয আমল (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত পালন করা, নফল যিকির ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না।

ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গুনাহ হয়। হারামের গুনাহরত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হল সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা।

ইবাদত কবুলের পূর্ব-শর্তসমূহ

১. ঈমান

শিরক, কুফর ও নিফাকমুক্ত তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

২. ইখলাস

ইখলাস অর্থ বিশুদ্ধকরণ। ইবাদতটি একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি বা অন্য কারো উদ্দেশ্যের সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না।

৩. ইত্তিবায়ে সুন্নত

কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণে পালিত হতে হবে। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম ইবাদত বলে গণ্য নয়।

৪. হালাল ভক্ষণ

ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ.

অর্থাৎ যে দেহের বৃদ্ধি হারাম দ্বারা হয় সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

ফরয ও নফলের দুটি দিক রয়েছে। পালন ও বর্জন। কিছু কাজ করা যেমন ফরয, তেমনি কিছু জিনিস বর্জন করাও ফরয। আল্লাহর নৈকট্যের পথে কর্মের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব বেশি।যে ব্যক্তি (তার উপরে) ফরয কোনো কর্ম পালন করছেন না বা (তার জন্য) হারাম কোনো কাজে রত রয়েছেন অথচ বিভিন্ন নফল মুস্তাহাব কর্ম পালন করছেন তার কাজ নিশ্চিতভাবে ইসলামের শিক্ষাবিরুদ্ধ।

নিজেকে নোংরা, অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এরপর যতটুকু সম্ভব সাজগোজ করতে হবে। এজন্য সকল নাজায়িয মাকরূহ কাজ বর্জন করা নফল ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাকরূহ কাজ করে ফেললে বেশি বেশি তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করলে তা বর্জন করবে; আর কোনো কিছু করতে নির্দেশ দিলে সাধ্যমত তা করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭২৮৮

মুসিবতের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য কবীরা গুনাহ্ বর্জন

যে সকল পাপের বিষয়ে কুরআনে কারীম বা হাদীসের মধ্যে কঠিন গযব, শাস্তি বা অভিশাপের উল্লেখ করা হয়েছে বা যে সকল কর্মকে কুরআন বা হাদীসে সরাসরি কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে বা কঠিন পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া যে কোনো সাধারণ পাপও সর্বদা করলে তা বড় পাপে পরিণত হয়।

ইমাম যাহাবী রাহ. 'আলকাবাইর' গ্রন্থে কবীরা গুনাহ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। যে সকল পাপকে কুরআন বা হাদীসে বড় পাপ বা কঠিন শাস্তি, আযাব, গজব বা অভিশাপের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেগুলির তালিকা প্রদান করেছেন। ইমাম যাহাবী রাহ. ছাড়াও আরো অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন।

কুরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের মূল দায়িত্ব দুটি ও পাপের সুত্রও দুটি। প্রথম দায়িত্ব, মানুষ তার মহান প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস,অগাধ ভালবাসা ও আস্থা পোষণ করবে এবং এ আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এমন সকল কর্ম আল্লাহর মনোনীত রাসূলের শিক্ষা অনুসারে পালন করবে। (একে হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক বলে) আর এ দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি করে এমন সকল কর্ম বা চিন্তা-চেতনাই প্রথম পাপ।

মানুষের দ্বিতীয় দায়িত্ব, এ পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করতে তার আশেপাশের সকল মানুষ ও জীবকে তারই মতো ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। (একে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বলে) আর এ দায়িত্বে অবহেলাজনিত কর্মই দ্বিতীয় প্রকারের পাপ। আল্লাহর সৃষ্টির কষ্ট প্রদান, ক্ষতি করা, শান্তি বিনষ্ট করা বা অধিকার নষ্ট করাই মূলত সবচেয়ে কঠিন অপরাধ।

হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার বিনষ্টকারী কবীরা গুনাহসমূহ

ক. ঈমান বিনষ্টকারী কবীরা গুনাহসমূহ

১. শিরক

→যেসব বিষয় ও গুণাবলি একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য এবং যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করা।

→আল্লাহ ছাড়া কাউকে শরীয়ত প্রদানের অধিকারী মনে করা, হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকারী মনে করা। শরীয়তের কোনো বিধান রহিত করার ক্ষমতাবান মনে করা।

→উপায়-উপকরণের ঊর্ধ্বের কোনো বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া। যেমন, কোনো মাযারওয়ালার কাছে বা কোনো পীরের কাছে সন্তান প্রার্থনা করা, ধনাঢ্যতা চাওয়া, রোগমুক্তি প্রার্থনা করা।

→কবরে বা মাযারে তাওয়াফ করা।

→কবরে বা মাযারে সিজদা করা।

→আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত করা।

→আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পশু জবাই করা।

→ভাষ্কর্য তৈরি করা বা স্থাপন করা ইত্যাদি।

২. কুফর

→ঈমান গ্রহণ না করা। ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করা। ইসলামী শরীয়তকে অস্বীকার করা। কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করা। শরীয়তের যে কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা। ইসলামের যে কোনো নিদর্শন নিয়ে উপহাস করা। রাসূলের অবমাননা করা। শরীয়তের যে

কোনো নিদর্শনের অবমাননা করা। খতমে নবুওত অস্বীকার করা। নবুওতের কোনো মিথ্যা দাবিদারকে বিশ্বাস করা, তাকে মুজাদ্দিদ বা মাহদী বা মাসীহ-এর সদৃশ মনে করা।

→কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ত-বিরোধী আইন প্রণয়ন করা।

→শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দÐবিধি অস্বীকার করা।

→কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের আইনী দিককে অস্বীকার করা।

→কুরআন সুন্নাহ্র স্পষ্ট বিপরীত আইনকে অনুসরণীয় মনে করা।

→ধর্মনিরপেক্ষতা’ মতবাদে বিশ্বাস করা।

→ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো চেতনা, সংস্কৃতি, মতবাদ, ভাবধারা পোষণ, লালন বা প্রসার করা।

→যেসব বিষয় অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতীক (বিশ্বাসগত হোক বা কর্মগত) সেসব বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা।

৩. নিফাক

ক. আকীদাগত নিফাক।

খ. কর্মগত নিফাক।

→কুরআন সুন্নাহ্র বিপরীত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা।

→ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক আলেমগণ বা দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র-মক্তব-মাদরাসার প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

৪. আকীদাগত বিদআত

৫. আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নির্ভয় থাকা।

৬. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৭. তাকদীরে অবিশ্বাস করা।

৮. গণক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা।

৯. মক্কার হারামে কোনো প্রকার অন্যায় করা।

১০. যাদু শিক্ষা বা ব্যবহার করা।

১১. অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা।

১২. নিজের জীবন, সম্পদ ও সকল মানুষের মহব্বতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া।

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা।

১৪. নিজের পছন্দে-অপছন্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও শরীয়তের অনুগত না হওয়া।

১৫. ফরয সালাত পরিত্যাগ করা।

১৬. যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা।

১৭. ওযর ছাড়া রমযানে সিয়াম পালনে অবহেলা করা।

১৮. ওযর ছাড়া জুমার সালাত পরিত্যাগ করা।

১৯. সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করা।

এগুলোর অধিকাংশই ঈমানকে মূল থেকে বিনষ্ট করে দেয়। আর কোনো কোনোটি এমন না হলেও সেগুলো ঈমানকে প্রায় বিনষ্ট করে দেয়।

খ. হারাম খাদ্য ও পানীয়

১. মদ পান করা।

২. মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা।

৩. হারাম প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা।

৪. শুকরের গোশত ভক্ষণ করা।

৫. স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা।

৬. প্রবাহিত রক্ত পান করা।

গ. পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক

১. পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া।

২. মিথ্যা বলার অভ্যাস ।

৩. কৃত্রিম চুল লাগানো ।

৪. শরীরে খোদাই করে উল্কি লাগানো।

৫. পুরুষের জন্য-

→মেয়েলি পোশাক বা চালচলন বা আচরণ করা।

→টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা।

→সোনা ও রেশম ব্যবহার।

→দাড়ি না রাখা।

৬. মেয়েদের জন্য-

→পুরুষালি পোশাক বা আচরণ করা।

→সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে বাইরে যাওয়া।

→মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বাইরে যাওয়া।

→সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া।

ঘ. অন্তর বা মনের পাপ

১. অহংকার করা।

২. নিজেকে বড় ভাবা।

৩. কোন মানুষকে হেয় করা বা ছোট ভাবা।

৪. হক অস্বীকার করা বা হক মেনে নিতে টালবাহানা করা।

৫. আসাবিয়্যাত তথা অন্যায় পক্ষপাত।

৬. উজব তথা আত্মগুণমুগ্ধতা।

৭. রিয়া ও প্রদর্শনেচ্ছা।

৮. হিংসা।

৯. ক্রোধ ।

১০. প্রশংসা ও সম্মানের লোভ।

১১. সম্পদের লোভ।

১২. কৃপণতা।

১৩. নিষ্ঠুরতা।

১৪. ইলম গোপন করা।

১৫. দ্বীনী ইলম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা।

অহংকার, হিংসা, কাউকে হেয় ভাবা, কৃপণতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত কবীরা গুনাহ হলেও এ ব্যাধি মানুষকে বান্দাহ্র হক নষ্ট বা ক্ষতিকারী অনেক পাপের দিকে প্ররোচিত করে। এগুলোর অভিব্যক্তি ব্যক্তির বাইরে প্রকাশিত হয়ে অন্যদের কষ্ট দেয়

হাক্কুল ইবাদ তথা সৃষ্টির অধিকার সংক্রান্ত কবীরা গুনাহ

১. আত্মহত্যা করা।

২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা তাদের কষ্ট দেয়া।

৩. সন্তান ও অধীনস্তদেরকে দ্বীনী শিক্ষা না দেয়া ও দ্বীনী তরবিয়ত তথা দ্বীনী মন-মানস ও রুচি-প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা না নেয়া।

৪. অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার ও প্রতিবাদ না করা।

৫. সুদ নেয়া, দেয়া, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া।

৬. ঘুষ নেয়া, দেয়া বা ঘুষ আদান-প্রদানের মধ্যস্থতা করা।

৭. যুলুম করা, আল্লাহর যে কোনো মাখলুকের প্রতি যে কোনো প্রকারের যুলুম করা। কারো জান, মাল বা মান-সম্মানে অন্যায় আঘাত করা।

৮. ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেয়া বা ভেজাল দেয়া।

৯. ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।

১০. জুয়া খেলা।

১১. কারো জমি বা সম্পদ আত্মসাত করা।

১২. মীরাস বণ্টন না করে নিজে তা দখল করে রাখা।

১৩. জমির সীমানা পরিবর্তন করা।

১৪. রক্তের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা।

১৫. আত্মীয়তার হক নষ্ট করা।

১৬. পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা।

১৭. বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেয়া।

১৮. কথাবার্তায় সংযত না হওয়া। যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা।

১৯. মিথ্যা শপথ করা।

২০. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

২১. প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য গোপন করা।

২২. প্রয়োজনীয় পণ্যের অন্যায় মজুতদারী।

২৩. ওয়াদা ভঙ্গ করা।

২৪. আমানতের খেয়ানত এবং সকল প্রকারের দুর্নীতি।

২৫. ধোঁকা ও প্রতারণা।

২৬. বিশ্বাসঘাতকতা।

২৭. কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল অশ্রাব্য কথা বলা।

২৮. অভিশাপ বা গালি দেওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া।

২৯. মুসলিমগণকে কষ্ট দেয়া বা গালি দেয়া।

৩০. কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেয়া।

৩১. কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩২. তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা।

৩৩. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা বা বলানো।

৩৪. স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া।

৩৫. একসাথে তিন তালাক দেয়া বা তালাক দিয়ে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি যুলুম করা।

৩৬. স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা।

৩৭. স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা।

৩৮. উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

৩৯. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৪০. কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়া।

৪১. সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে কাফের বলা বা মনে করা।

৪২. মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা।

৪৩. চোগলখুরি করা।

৪৪. গীবত বা পরচর্চা করা।

৪৫. অসত্য দোষারোপ করা।

৪৬. পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহবান করা।

৪৭. কারো প্রতি অস্ত্রজাতীয় কিছু উঠানো বা হুমকি প্রদান করা।

৪৮. জেদাজেদী ঝগড়া বা কলহ কোন্দল করা।

৪৯. কোনো মুসলিমের প্রতি হিংসা বা শত্রæতা পোষণ করা।

৫০. মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেয়া।

৫১. কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অর্থ লাভ করা।

৫২. কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেয়া।

৫৩. ইসলাম-নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) অপরাধীর শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা।

৫৪. যে অপরাধে কাউকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়- এমন কোনো অপরাধ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা।

এমনকি ডাকাতি, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত সে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা জায়েয হবে না। একমাত্র উপযুক্ত আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও শাস্তি নির্ধারিত হবে। যথাযথ বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ।

৫৫. ইসলামীক রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ করা।

৫৬. রাষ্ট্র বা প্রশাসনের অন্যায় বা যুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা।

৫৭. ইসলামীক রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক না কেন।

৫৮. জবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা।

৫৯. (হাট-বাজার, রাস্তাঘাটে) চাঁদাবাজি করা।

৬০. মুসলিম সমাজে বসবাসরত জিযিয়াদানকারী অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দেয়া বা তার অধিকার নষ্ট করা।

৬১. আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট দেয়া বা তাদের সাথে শত্রতা করা।

৬২. কোনো নবী বা রাসূলের সমালোচনা করা।

৬৩. মহান সাহাবীগণের সমালোচনা করা।

৬৪. মহান আহলে বাইতের সমালোচনা করা।

৬৫. মুজতাহিদ ইমামগণ এবং সালাফে সালেহীন তথা উম্মতের পূর্বসূরী অনুসরণীয় উলামা-মাশায়েখের সমালোচনা করা।

৬৬. কোনো মজলিসে এসে খালি জায়গায় না বসে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা এমনভাবে বসা, যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয়।

৬৭. নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা।

৬৮. কোন প্রাণির মুখে আগুনে পুড়িয়ে বা দাগ কেটে মার্ক করা।

৬৯. অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা।

৭০. কেউ আল্লাহর দোহাই দিয়ে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে তার প্রতি বিরক্ত হওয়া বা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা।

৭১. নিরপরাধ মানুষকে বিশেষত মহিলাকে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।

৭২. সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করে এমন কোনো গল্প-গুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা।

আরো কিছু কবীরা গুনাহ

১. কর্মগত বিদআত

ক. মাযারে বা দরবারে ওরস করা।

খ. ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে জাহেলিয়াতের রীতি-নীতি অনুসরণ করা।

→মাযারে বা সমাধিতে বা স্মৃতিস্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।

→মৃতব্যক্তির লাশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।

→কবরের সামনে বা লাশের সামনে সম্মানার্থে নীরবতার প্রথা পালন করা ।

→মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বালন করা।

২. প্রাণীর ছবি আঁকা।

৩. অফিস-আদালতে, ঘরে বা রুমে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা।

৪. ব্যাভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার।

৫. পরকীয়া।

৬. পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে যে কোনো ধরনের অবৈধ সম্পর্ক।

৭. স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ককে সমর্থন করা। তেমনিভাবে স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীর অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ককে সমর্থন করা।

(তবে এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট শরীয়তসম্মত দলীল ছাড়া শুধু ধারণার ভিত্তিতে বা কোনো আলামতের উপর নির্ভর করে কারো প্রতিই কারো কুধারণা করা হারাম।)

৮. পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল ছবি দেখা।

৯. কুদৃষ্টি করা।

১০. অশ্লীল উপন্যাস পড়া।

১১. টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইলের অবৈধ ব্যবহার। বিশেষ করে এগুলোর মাধ্যমে চোখ, কান বা মন-মস্তিষ্কের কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

১২. স্ত্রীর জন্য স্বামীর মোবাইল বা স্বামীর জন্য স্ত্রীর মোবাইল চেক করা। এককথায় যে কোনো ধরনের 'তাজাসসুস' তথা অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধানই নাজায়েয।

১৩. খেলাধুলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা।

১৪. মুনাফিক বেদ্বীন বা যে কোনো ইসলাম-বিদ্বেষীর ঢালাও প্রশংসা করা বা তাকে অনুসরণীয় বলা বা মনে করা।

১৫. অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব, পূজা-পার্বণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা।

উপরের সকল পাপই অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআন ও হাদীসে এগুলোর ভয়ংকর শাস্তি ও খারাপ পরিণতির কথা উল্লেখ রয়েছে। । তবে কোনো কোনো পাপকে নেক আমলের কারণে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আবার কোনো কোনো পাপ সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। সকল ইবাদত বিনষ্টকারী পাপের মধ্যে রয়েছে- শিরক, কুফর, আকীদাগত বিদআত, অহংকার, হিংসা, অপরের হক (অধিকার) নষ্ট করা, গীবত করা ইত্যাদি।

যা কিছু দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাই বড় মুসিবাত।
দুষ্কৃতকারীদের পাপাচারে গোটা জমিন ফিতনা ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ফলশ্রুতিতে শাস্তি স্বরুপ মানবসমাজ বালা মুসিবতে নিপতিত হয়েছে।

শেষ কথা হল, প্রত্যেকে নিজেদের ইসলাহের প্রতি মনোনিবেশ করবে; নিজেকে ধোঁকার মাঝে রাখবে না। মুসলিমগণ অধিক পরিমাণে ইলম চর্চা এবং দ্বীনের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করবে। গুনাহসমুহ কে পরিত্যাগ করবে। গুনাহ পরিত্যাগ হচ্ছে বড় সবর। ব্যাক্তিগত,সামাজিক সব দিকেই সবরের অনুশীলন করতে হবে। এভাবে নিজের এবং সমাজের ইসলাহ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দাওয়াত ও তালীমকে ব্যাপক করতে হবে এবং সাধ্যমতো 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।তাহলে শাস্তি স্বরুপ বালা মুসিবত থেকে মানবসমাজ সুরক্ষিত থাকবে। বিইদ্বনিল্লাহ।

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.

থিসিসের উৎস সমুহ যথাক্রমে

তাফসিরে ইবনু কাসির

Quranshareef.org

http://www.quraanshareef.org/

আই হাদিথ ডট কম

https://ihadis.com/

হাদিথ বিডি ডট কম

https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237

আল কাউসার ডট কম

https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

https://www.alkawsar.com/bn/article/3403/

https://www.alkawsar.com/bn/article/2702/

মুসলিম বাংলা ডট কম

https://muslimbangla.com/sura/33/tafsir/10

https://muslimbangla.com/sura/29/verse/2

ডেইলি ইনকিলাব ডট কম

https://dailyinqilab.com/islamic-life/article/695578

অন্যান্য ওয়েব সাইট সমূহ

কিতাব: মুখতাসার যাদুল মা'আদ

কিতাব: সবর ও শোকর

কিতাব: হৃদয়ের দিনলিপি

কিতাব: লা- তাহযান